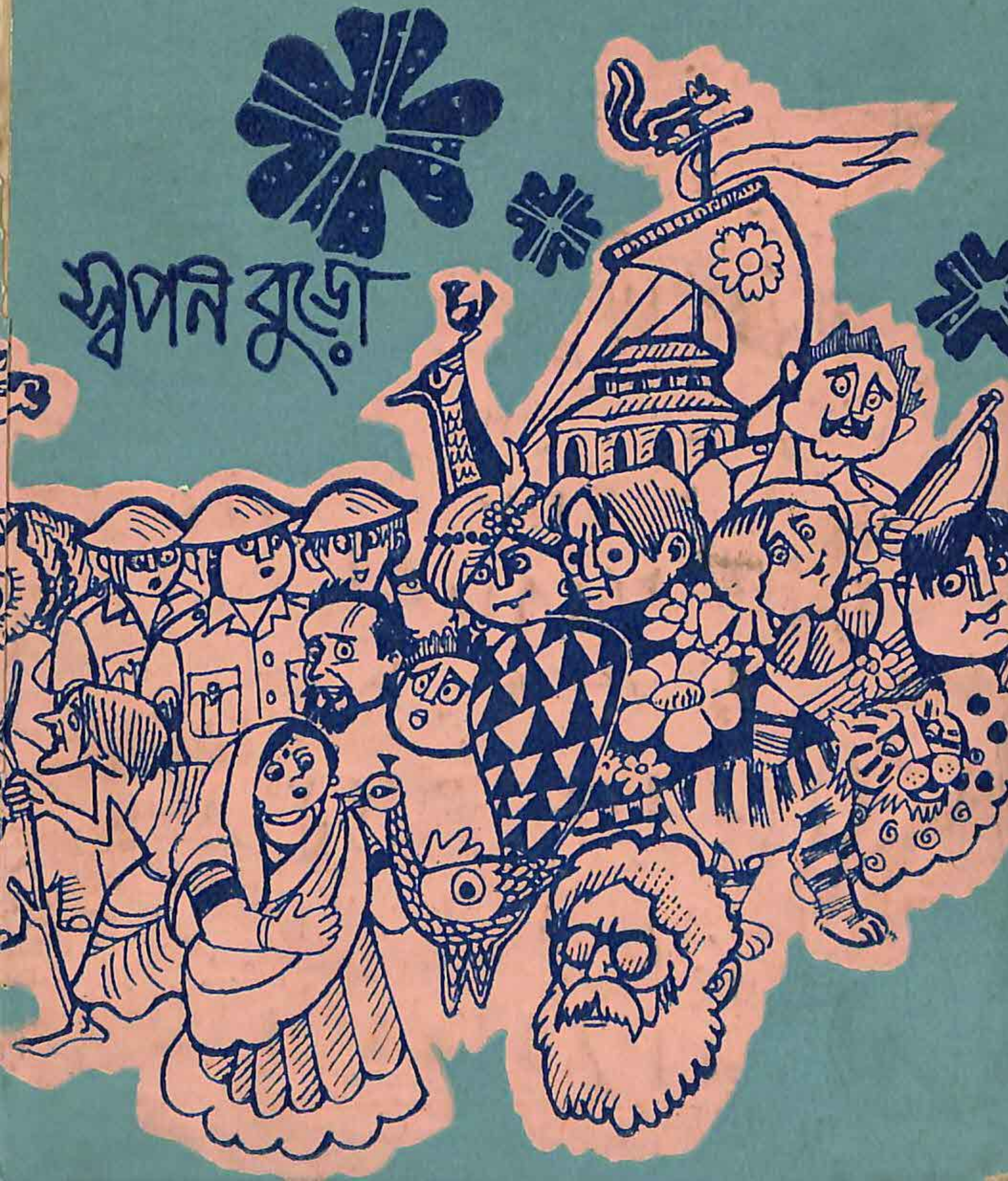
নানা রঙের গল্প

স্বপন বুড়ো





ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
[স্থাপিত : ১৯৪০]
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড : : কলিকাতা-৭০০০০৭

প্রথম
সংস্করণ :
ভাদ্র, ১৩৯০

টা. ১০.০০

প্রচ্ছদ :
সুবোধ
দাশগুপ্ত

প্রকাশন : কনকপ্রভা বসু
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

মুদ্রণ : অসিত সরকার, গ্রন্থনা,
৩৪, শ্যামপুকুর স্ট্রিট, কলকাতা-৪

উৎসর্গ

তোদের হাতে—
সোনা-রূপা-দূর্বা
সাথে আছে মুক্তি,
দস্যির সেরা ওরা
নাই কভু সুপ্তি !
হাসি আর নৃত্য
সদা আছে সঙ্গে—
এমন নাত্‌নী কভু
মেলে নাকো বঙ্গে।
হাসি আর কান্না
রয় দেখি জড়িয়ে
ভাব আর আড়ি সদা
রয় ঘর ভরিয়ে।
চারটি নাত্‌নী মিলে—
অপরূপ কাণ্ড—
আমাদের ঘরে আছে
মহা মধু ভাণ্ড॥

—স্বপনবুড়ো

সূচীপত্র

তিন কিশোরের কাণ্ড

তিনটি কিশোর এক সঙ্গে পরীক্ষা দিতে বসেছিল।

কিন্তু পরীক্ষার হলে ঢোকবার আগে ওরা পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করে গিয়েছিল—সুতো ঝুলিয়ে পরীক্ষার প্রশ্ন বাইরে চালান দেবে। সেখানে ভাই-ব্রাদাররা হাতাহাতি প্রশ্ন-পত্রের জবাব লিখে আবার ফেরৎ পাঠাবে। সুতো ধরে টেনে তোলা হবে দোতলার হলঘরে সেই লিখিত জবাবগুলি।

কিন্তু এমন সুন্দর পরিকল্পনা একেবারে ভেস্তে গেল!

যে পরিদর্শক হলঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তিনি হঠাৎ জানালা দিয়ে দেখলেন, কতকগুলি ভূতুড়ে কাগজ দিব্যি দেয়াল বেয়ে উঠে আসছে।

একটি ছেলে আবার ঐকান্তিক আগ্রহে সেইগুলি সংগ্রহ করতে গিয়েছিল। হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেল পরিদর্শকের হাতে। সেই ছেলেটির কাছে আবার বাকি দুই জনের নাম পাওয়া গেল। কিছু কিছু বইয়ের ছাপা কাগজও সেই সঙ্গে খুঁজে পাওয়া গেল—তাদের পকেটে। সুতরাং হলঘরে বসা আর সম্ভবপর হল না। মুক্ত রাজপথে বেরিয়ে এলো তিন বন্ধু।

গোবর-গণেশ-গোঁসাই।

এই হচ্ছে তিনটি কিশোরের চলতি নাম।

বাড়ীতে আর ইস্কুলে সবাই ওদের ঐ নামেই ডাকে।

তখন গোবর-গণেশ-গোঁসাই-এর ত্রিশঙ্কুর মতো অবস্থা হল!

না পারলে তারা পরীক্ষার হলে ঠাঁই করে নিতে, আর না পারলে নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরে যেতে।

গোবর বললে, এ প্রাণ আর রাখবো না—

গণেশ বললে, চল, আমরা রেলের লাইনে শুয়ে পড়ি—

গোঁসাই প্রতিবাদ জানিয়ে বললে, ওরে বাবা, মরতে আমার ভারি ভয়।

সুতরাং মরা ওদের হল না। তিন জনে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

হঠাৎ গোবর বললে, বাড়ীতে ফেরবার যখন উপায় নেই, তখন চল্— আমরা এক জায়গায় পালিয়ে যাই—

গণেশ ফোঁড়ন কাট্‌লে, কোথায় যাবি শুনি? পকেট ত একেবারে গড়ের মাঠ!

গোঁসাই বললে, আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে—

আর দু'জন কুতূহলী হয়ে উঠল।—কি প্ল্যান রে,—কি প্ল্যান?

গোঁসাই বললে, বাঁকুড়ার এক অজ পাড়াগাঁয়ে আমার এক দিদিমা আছে। একা থাকে বুড়ী। কতবার আমায় যেতে বলেছে। বুড়ীর বাগ-বাগিচা, পুকুর, ধানী জমি—অনেক কিছু আছে। কিন্তু তিন কুলে কেউ নেই। চল, সেইখানে গিয়ে কয়েকদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকি।

গোবর বললে, পরামর্শটা মন্দ নয়। কিন্তু সেখানে যেতে গেলে আবার ট্রেনের টিকিট কাটতে হবে।

গোঁসাই জবাব দিলে, আমার পকেটে কয়েকটা টাকা আছে। ওতেই চলে যাওয়া যাবে দিদিমার কাছে।

তিন জনে মিলে টিকিট কেটে ট্রেনে চেপে বসল।

দিদিমা ওদের তিন বন্ধুকে পেয়ে মহা খুশী।

বল্‌লে, ভুলেও দিদিমাকে মনে পড়ে না। তবু ভাগ্যি এসেছিস।

—ওই চেয়ে দেখ, আমার গাছের ফল-ফুলুরী ইঁদুরে-বাঁদরে খায়। পুকুরের মাছ সাত ভূতে জাল দিয়ে ধরে নিয়ে যায়। নলেন গুড় আছে, মুড়ির মোয়া আছে, ক্ষীরের তক্তি আছে…কি খাবি বল?

দিদিমার কথা শুনে তিন বন্ধু ত মহাখুশী।



দিদিমাই ওদের তিনজনকে একটা ঘরে শীতলপাটি বিছিয়ে দিলে।

পুরোনো তোষক রোদ্দুরে দিয়ে বিছিয়ে দিলে তার ওপর। বললে, নে, এর ওপর আরাম কর। আমার হাঁড়িতে মুড়িও আছে। গাছে আছে ধানী লঙ্কা। দিব্যি তেল মুড়ি মেখে দিচ্ছি। শুধু চা-টাই তোদের দিতে পারবো না।

তিন বন্ধু মহা আমেজ করে বোগদাদের খলিফার মতো দিব্যি নানা স্বাদের খানা খেতে লাগল। গোঁসাই কোত্থেকে এক প্যাকেট তাস নিয়ে এলো।

দিন রাত তাস খেলে, পাড়া বেড়িয়ে, আর পুকুরে মাছ ধরে ওদের দিন এক রকম মন্দ কাটছিল না।

গোঁসাই একদিন দিদিমার কয়লার ঘরে ঢুকে দেখ্‌লে ঘরের এক কোনে একটি পাথরের মূর্তি পড়ে আছে। নাক-কান ভাঙা, একটা হাতের আঙুলও খসে পড়েছে। নিতান্ত অযত্নে পড়ে আছে— কয়লাগুলির মধ্যে।

সেই দিন গভীর রাত্রে তিন বন্ধুর গোপন পরামর্শ সভা বসল।

গোঁসাই বললে, আমার মাথায় একটি চমৎকার প্ল্যান এসেছে।

গোবর আঁৎকে উঠে বল্‌লে, আবার প্ল্যান? কেন, এইত বেশ আছি।

গোঁসাই উত্তর দিলে, ওরে বোকচন্দর, চিরটা কাল দিদিমা বেঁচে থাক্‌বে না। তার ভেতর আখের গুছিয়ে নিতে হবে ত? পেটে বিদ্যে নেই, তাই চাকরী জুট্‌বে না। হাতে টাকা নেই, তাই কোনো ব্যবসা করতে পারবো না। কিন্তু বিনা মূলধনে আমরা যদি ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করে নিতে পারি?

গোবর বললে, আহা! প্ল্যানটা কি তাই আগে খোলসা করে বল্ না!

গোঁসাই তখন জিলিপির প্যাঁচ খোলে।

—একটা ভাঙা মূর্তি পেয়েছি—দিদিমার কয়লার ঘরে।

গণেশ শুধোয়, তাতে কি হবে? গোঁসাই মুখ টিপে টিপে হাসে। বলে, বুদ্ধি খরচ করলে, ওই থেকেই লক্ষ টাকা লাভ।

—লক্ষ টাকা লাভ? বাকি দুই বন্ধু আঁৎকে ওঠে।—লটারী-টটারীর ব্যাপার নাকি?

—উঁহু! তার চাইতেও মজাদার ব্যাপার।

গোঁসাই তখন তার প্ল্যানটা খোলসা করে। —শোন্ তোদের সব বলি। আজ রাত্রেই আমরা ওই ভাঙা বিষ্ণু-মূর্তিটাকে পুকুরের ধারে পুঁতে রেখে আসব।

—তাতে তোকে কে লাখ টাকা এনে দেবে শুনি?

—তোদের বড় অধৈর্য! আগে গোটা প্ল্যানটা শোন্—

—বল্-বল্ শুনি সবটা—

গোঁসাই আবার শুরু করে, রাত্তিরে আমি স্বপ্ন দেখবো,—ওই বিষ্ণুমূর্তি আমায় যেন স্বপ্নে বলছে, তাকে উদ্ধার করতে। ওখানে একটি মন্দির নির্মাণ করে পুজোর ব্যবস্থা করতে। আগেই আমরা

গিয়ে কিন্তু মূর্তি তুলব না। প্রথমে বল্‌ব দিদিমাকে। তারপর গ্রামস্থ লোকদের ডেকে জড় করব। সকলের সামনে গর্ত খুঁড়ে ওই বিষ্ণুমূর্তি উদ্ধার করা হবে। তারপর দেখ না কি হয়!

যেমন কথা তেমনি কাজ।

সকালবেলা উঠেই গোঁসাই চ্যাঁচামেচি সুরু করে দিলে। স্বপ্নে বিষ্ণুদেব তাকে ডাক দিয়েছে। তাকে উদ্ধার করতে হবে। সেইখানে মন্দির নির্মাণ করে নিত্য পুজোর ব্যবস্থা করতে হবে।

দিদিমা শুনে ছুটোছুটি সুরু করে দিলেন। ঠাকুর ঘর থেকে শঙ্খ বের করলেন। ধান-দুর্বোর ব্যবস্থা করলেন। প্রদীপ জ্বাললেন। পাড়া-প্রতিবেশীদের ডেকে নিয়ে এলেন। শুভক্ষণ দেখে বিষ্ণুমূর্তি উদ্ধার করা হবে।

তিন বন্ধু তখন গদাই-লস্করী চালে সকলকে নিয়ে পুকুরের ধারে হাজির হল।

গাঁয়ের কয়েকটি তরুণ উৎসাহী ছেলে জুটে গেল। তারা কোথা থেকে কোদাল খন্তা ইত্যাদি জোগাড় করে নিয়ে এলো। সেই সঙ্গে আরো বহু লোক জুটে গেল। কিষাণেরা ক্ষেতে যাচ্ছিল, তারা ছুটে এলো। ঘরামীর দল কাজে যাচ্ছিল,—তারা এগিয়ে এলো; মেয়েরা কলসী করে জল নিতে এসেছিল,—তারা কলসী ফেলে এসে ভীড় জমালে। যখন দেখা গেল, ভীড়টা বেশ ঠাসাঠাসি হয়েছে, ঠিক সেই সময় গোঁসাই চীৎকার করে উঠল, এই ত! এই জায়গাটাই আমি স্বপ্নে দেখেছি। এইখানটাই খুঁড়তে হবে।

উৎসাহী যুবকের দল ঘন ঘন কোদাল চালাতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ বাদে একটা শব্দ হল।

গোঁসাই চোখ দুটো বড় বড় করে বললে, হুঁসিয়ার ভাই সব। মূর্তি এইবার মিল্‌বে।

তখন সকলে মিলে আরো কিছুটা মাটি সরিয়ে সেই ভাঙা বিষ্ণুমূর্তি বের করে ফেলল।

চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠল। শঙ্খ বাজল। খৈ ছিটিয়ে দেওয়া হল। একদল ছেলে মুদি দোকান থেকে বাতাসা নিয়ে এসে সবাই-কার মধ্যে ছিটিয়ে দিল। দিদিমা এগিয়ে এসে প্রদীপ ধরে বরণ করে নিলেন। মাটি-মাখা ভাঙা বিষ্ণুমূর্তি তিনিও চিনতে পারলেন না।

এই বিষ্ণুমূর্তি পাওয়ার খবর গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। এক-দিকে দিদিমার ঘরে পুজোর আয়োজন চলল। অন্যদিকে সেই পুকুরের কোণে বিষ্ণুমন্দির নির্মাণের কাজ সুরু হয়ে গেল।

দলে দলে লোক এসে প্রণামী দিয়ে যেতে লাগল।

গাঁয়ের মানুষেরাই দলবদ্ধ হয়ে মন্দির নির্মাণের কাজে লেগে পড়ল। কলকাতার খবরের কাগজে বিষ্ণুমূর্তির ছবি দিয়ে সেই চাঞ্চল্যকর খবর ছাপা হল।

এদিকে মন্দির নির্মাণের কাজও সমাধা হয়ে গেল।

বিভিন্ন গ্রাম থেকে দলে দলে মানুষ আসতে লাগল বিষ্ণুর পুজোর জন্যে। গোঁসাই এই সুযোগে পট্টবস্ত্র পরিধান করে সেবায়েৎ হয়ে বসল। "শ্রীবিষ্ণু তাবিজ" ওরা তিনবন্ধু রাতারাতি বের করে ফেললে।

এই শ্রীবিষ্ণু তাবিজ ধারণ করলে সব রোগের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে। পাঁচসিকে দিলেই তাবিজ পাওয়া যাবে। সামনের পুকুরে স্নান করে এই শ্রীবিষ্ণু তাবিজ ধারণ করতে হবে।

দলে দলে মানুষ ছুটে আসতে লাগল, এই শ্রীবিষ্ণু তাবিজ ধারণ করবার জন্য। কার হাঁপানি হয়েছে, কে আমাশায় ভুগছে, কে বাতে পঙ্গু হয়ে পড়েছে, কার নাতি হচ্ছে না,—সবাই দলে দলে এসে ভীড় জমাতে সুরু করল এই ডালিমফুলী গাঁয়ে।

কল্‌কাতার কাগজে খবর ছাপা হওয়ায় দূর দূর অঞ্চলের মানুষেরা —কেউ গরুর গাড়ীতে, কেউ ঘোড়ায় চেপে, কেউ রিক্সা করে, আবার অনেকে দল বেঁধে ট্রাকে-বাসে চেপে আসতে লাগল।

এই ছোট্ট ডালিমফুলী গাঁয়ে এত লোকের জায়গা হল না। তারা মাঠের মাঝখানে তাঁবু খাটিয়ে থাকতে লাগল। পুকুরের জল স্নান করতে করতে কাদা কাদা হয়ে গেল।

তিন বন্ধু কিন্তু শ্রীবিষ্ণু তাবিজ বিক্রী করে বহু টাকা কামাই করতে লাগল।

গোঁসাই মিটি-মিটি হাসতে হাসতে বললে, লাখো টাকা হতে আর কত দেরী?

যে ভাবে মানুষ ছুটে আসতে লাগলো, তাতে লাখো টাকা জমতে বেশী দেরী হবে না। আরো মানুষ,—আরো গাড়ী,—আরো "শ্রীবিষ্ণু কবচ"-প্রত্যাশী ভক্ত ছুটে আসতে লাগল এই ডালিমফুলী গাঁয়ে।

এত লোক, কিন্তু খাবার দাবারের ব্যবস্থা নেই! কয়েকটি হোটেল খুলে দিল গোঁসাই। অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে কলেরা রোগ সুরু হয়ে গেল।

পোকার মত মানুষ মরতে লাগল। তবু কারো ভ্রূক্ষেপ নেই। কাদা জলে স্নান আর শ্রীবিষ্ণু কবচ ধারণ চলতে লাগল।

এতদিনে পুলিশের টনক নড়ল! খবর পৌছুল ওপরের কর্তাদের কাছে।

গ্রামকে গ্রাম রোগে উজাড় হয়ে যাচ্ছে। তবু শ্যামাপোকার মতো লোকেরা মন্দিরের দিকে ছুটে আসতে লাগল।

অবশেষে একদল পুলিশ জীপে করে এসে হাজির হল। তারা খুঁজে পেতে সেই তিন বন্ধু গোবর-গণেশ-গোঁসাইকে গ্রেপ্তার করে সদরে চালান দিলে।

তখনো রোগাক্রান্ত লোকেরা কাদাজলে লুটোপুটি খেয়ে শুধু হায় হায় করতে লাগল!

হুম্‌কার হুগ্‌গা টুনটুনি পাখী

হুম্‌কা ছেলেটি বড় দুঃখী।

অনেকগুলি ভাইয়ের মধ্যে গরীব বাপের সংসারে খুব কষ্টের সঙ্গেই মানুষ হচ্ছিল।

কিন্তু বিধাতার বুঝি তা-ও সইল না।

বাপ মারা যেতেই ভাইরা ওকে তাড়িয়ে দিলে।

হুম্‌কা সকলের ছোট। ভাইরা সব এক জোট হয়েছে। তাই ওদের সঙ্গে পেরে উঠবে কেন?

ভাইরা বললে, তুই কোনো কাজের নোস। ক্ষেতে খাটিস নে, গরু চরাতে পারিস নে। লাঙল চালাতে পারিস নে, ক্ষেতে জল দিতে জানিস নে। বসে বসে তোকে দুবেলা কে খাওয়াবে শুনি?

হুম্‌কার দুই চোখ জলে ভরে এলো।

সে সবাইকার ছোট, সেও তো বাপের ছেলে। বাড়ীর ভাগ ওকে দেবে না কেন? ক্ষেত-খামারের ভাগ কেন পাবে না? বাড়ীতে গাই, ছাগল, হাঁস, মুরগী আছে, তারও ভাগ কেন তার মিলবে না? সে ছোট বলেই ভাইরা ওকে তাড়িয়ে দিচ্ছে।

হুম্‌কার মনে খুব কষ্ট হল। দুই চোখ জলে ভরে এলো। তবু ভাইদের কাছে কিছু চাইলে না। শুধু বল্‌লে, হুগ্‌গা টুনটুনী পাখীটা আমার। ওকে আমি নিয়ে যাবো—

ভাইরা বললে, নিয়ে যা তোর হুগ্‌গা টুনটুনী পাখী। কে ওকে দুবেলা আবার খাওয়াবে? কে খাঁচা সাফ্‌ করবে রোজ?

পাখীশুদ্ধ খাঁচা ছুঁড়ে ফেলে দিলে ভাইরা।

হুম্‌কা আদর করে হুগ্‌গা টুনটুনী পাখীকে ওর কাঁধে তুলে নিলে, তারপর চোখের জল মুছতে মুছতে বাড়ী ছেড়ে চলে গেল।

কোন্ দিকে ডুম্‌কা যাবে কিছু জানে না। তার থাকবার কোন ঠাঁই নেই। কে ওকে খেতে দেবে? কে ওকে থাকতে দেবে?

ডুম্‌কা কিছু জানে না। ডুম্‌কা যত পথ চলে তত তার চোখের জল পড়ে।

ডুগ্‌গা টুনটুনী পাখী ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, কেঁদো না ডুম্‌কা। আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি। ভয় কি, তোমার দাদারা তোমায় তাড়িয়ে দিয়েছে? তোমার দিন চলেই যাবে। তুমি তো কারো ক্ষতি করো নি, কারো মনে কষ্ট দাও নি।

ডুগ্‌গা টুনটুনীর কথা শুনে ডুম্‌কা শান্ত হল।

তার কান্না বন্ধ হল। ডুগ্‌গা টুনটুনীও ওকে গান শোনাতে লাগলো। এইভাবে ডুম্‌কা আবার পথ চলতে লাগলো।

তার কাঁধে রয়েছে ডুগ্‌গা টুনটুনী পাখী। তাকে কত গান আর কত গল্প সে শোনাতে লাগলো।

যেতে যেতে এক রাজ্য ছেড়ে আর এক রাজ্যে পৌঁছে গেল ডুম্‌কা। সামনেই দেখলো—এক বিরাট দুর্গ ভেঙে পড়ে আছে।

ডুগ্‌গা টুনটুনী পাখী তাকে বল্‌লে, শোনো ডুম্‌কা, তোমার আগের জন্মের কথা মনে করো। এই যে ভাঙা দুর্গ দেখছ, তুমি ছিলে তার অধিপতি মানে দুর্গেশ। এই ভাঙা দুর্গের তলায় অনেক গুপ্ত ধন লুকোনো আছে। এ-সব সোনার মোহর। সব কিছুই তোমারই প্রাপ্য। এখন ওখান থেকে কিছু মোহর তুলে নিয়ে এসো। তারপর আবার আমরা যাত্রা শুরু করবো। অনেক কাজ তোমায় করতে হবে। আমি সব কিছু তোমায় মনে করিয়ে দেবো।

ডুগ্‌গা টুনটুনীর কথায় ডুম্‌কার আগের জন্মের কথা মনে পড়ে গেল। সে ভাঙা দুর্গের তলা থেকে কিছু মোহর কুড়িয়ে নিয়ে এলো।

আবার দুজনে পথ চলতে লাগলো।

আরো কিছুটা দূর যাবার পর হুম্‌কা দেখলে, অনেক নৌকো তৈরি হচ্ছে। ডুগ্‌গা টুনটুনী হুম্‌কাকে কানে কানে কইলে, শোনো হুম্‌কা, তোমার আগের জন্মে এই সব ছুতোর মিস্ত্রি তোমার জন্য বড় বড় বাণিজ্যপোত আর যুদ্ধের জাহাজ তৈরি করতো। তাই নিয়ে তুমি দেশ-বিদেশে বাণিজ্য করতে যেতে। ওই যুদ্ধ জাহাজে উঠে কত শত্রুকে তুমি হারিয়ে দিয়েছ। সামনে দেখছ কত বড় নদী। তোমাকে পার হতে হবে। তুমি এখন কিছু মোহর এই ছুতোর-মিস্ত্রিদের দাও। তারা তোমার জন্যে বড় বড় নৌকো আর যুদ্ধের জাহাজ তৈরি করে দেবে।

হুম্‌কা তখন গিয়ে সর্দার মিস্ত্রির সঙ্গে দেখা করলে। সব কথা তাকে খুলে বললে।

সর্দার মিস্ত্রি তাকে কুর্ণিশ করে কইলে, শুনেছি আমার ঠাকুর্দা ওই দুর্গের অধিপতির নৌকো আর যুদ্ধের পোত তৈরি করতো। আমাকে কিছু টাকা আগাম দাও। তোমার জন্যে বড় নৌকো আর যুদ্ধের জাহাজ তৈরি করে দেবো।

হুম্‌কার কাছে যে মোহর ছিল, তার থেকে কয়েকটা মোহর হুম্‌কা ছুতোর মিস্ত্রির হাতে তুলে দিল। ওরা তখন আবার পথ চলতে লাগলো।

এরপর ডুগ্‌গা টুনটুনী পাখী হুম্‌কাকে নিয়ে হাজির করলো এক দরজীর বাড়ীতে।

ডুগ্‌গা টুনটুনী দরজীকে ডেকে হুম্‌কার পরিচয় দিলে। তারপর কইলে, ওই দুর্গের অধিপতির মতো পোশাক তৈরি করে দিতে হবে। হুম্‌কা কয়েকটা মোহর দরজীর হাতে দিয়ে আবার ডুগ্‌গা টুনটুনীকে নিয়ে সামনের পথে এগিয়ে চল্‌লো।

এইবার ওরা এলো রাজমিস্ত্রির বাড়ীতে।

রাজমিস্ত্রি হুম্‌কার পরিচয় পেয়ে ওকে খুব খাতির করলে। বললে, আমার ঠাকুর্দা ওই দুর্গ তৈরি করেছিল। তার মুখে ছেলে-

বেলায় কত গল্প শুনেছি। আমি ওই দুর্গ নতুন করে তৈরি করে দেবো। তবে আমায় কিছু আগাম টাকা দিতে হবে।

ডুম্‌কা কয়েকটা মোহর রাজমিস্ত্রির হাতে তুলে দিল। এরপর ডুগ্‌গা টুনটুনী পাখী এমন একটা লোকের কাছে গিয়ে হাজির হল,—বনের সব পশুপাখী তার কথা শোনে।

লোকটি ডুম্‌কার পরিচয় পেয়েই মাথা নাড়তে লাগলো। বললে, হ্যাঁ আমি তোমার মুখ দেখেই চিনতে পেরেছি। একেবারে আগের কর্তার মতোই তোমার মুখখানি! আচ্ছা, শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে তোমার যত হাতি আর ঘোড়া দরকার হয় সব আমি জোগাড় করে দেবো। এখন আমায় কিছু টাকা দিয়ে যাও।

ডুম্‌কা কয়েকটা মোহর লোকটার হাতে তুলে দিয়ে আবার পথ চলতে লাগলো।

তখন ডুগ্‌গা টুনটুনীর পরামর্শ মত—বনের ধারে ওদের যত প্রজা ছিল তাদের সর্দারকে ডেকে আনলো। সর্দারকে সব কথা খুলে বলতে সর্দার তাঁদের কথায় রাজি হয়ে গেল।

সর্দার বললে, আমার হাজার হাজার লোক ধনুক-বাণ-বর্শা-হাতিয়ার নিয়ে এককালে কত যুদ্ধ করেছে ওই দুর্গের জন্যে। তা তুই যখন আবার ফিরে এসেছিস, আমি আমার হাজার হাজার লোককে আবার তৈরি করবো যুদ্ধের জন্যে। ওরা তীর-ধনুক-ঢাল-তরোয়াল-বর্শা-হাতিয়ার পেলে যা লড়বে না,—সে আর দেখতে হবে না। আবার তোকে লড়াইয়ে জিতিয়ে দেবো।

ডুম্‌কা সর্দারকে খুশী করে, ডুগ্‌গা টুনটুনীকে কাঁধে নিয়ে আবার পথ চলতে শুরু করলো। টুনটুনী বল্‌লে, এইবার রসদের ব্যবস্থা করতে হবে। এতগুলো লোক যে লড়বে তার জন্যে রসদের আয়োজন করতে হবে না?

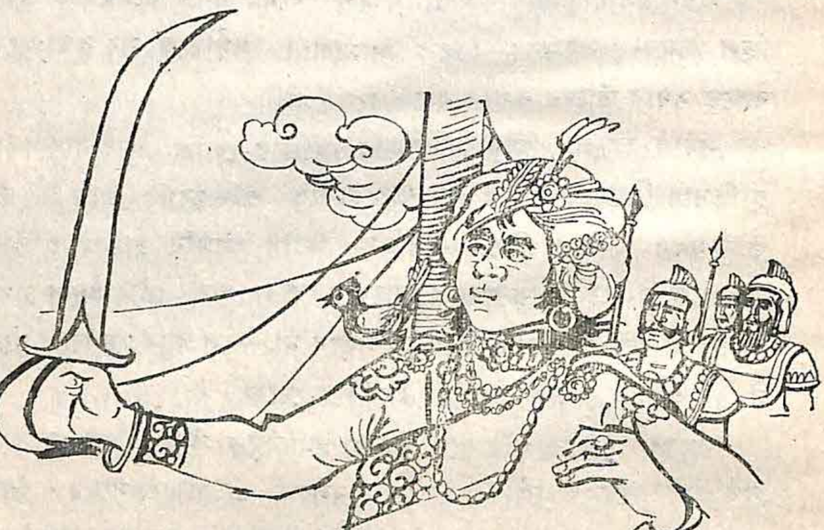
তখন টুনটুনী পুরোনো দুর্গের রসদদারের বাড়ী গিয়ে হাজির হল। সব কথা শুনে, আর ডুম্‌কাকে দেখে রসদদার বল্‌লে, রসদ জোগাতে

আমি রাজি আছি ভাই। কিন্তু আমাকে কিছু আগাম টাকা দিতে হবে। ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগী সব কিছুর ব্যবস্থা করতে তো হবে। আর গম ও চালের গুদাম তৈরি করতে হবে।

হুম্‌কা আগের মতোই কয়েকটা মোহর রসদদারের হাতে তুলে দিলে।

ইতিমধ্যে—রাজমিস্ত্রির দল রাতারাতি দুর্গ মেরামত করে ফেলেছে। ছুতোর মিস্ত্রির দল বড় বড় নৌকো আর যুদ্ধপোত গড়ে তুলেছে—বনের পশু বশ করার মানুষটা রাশি রাশি ঘোড়া-হাতি-উট সংগ্রহ করে সাজিয়ে ফেলেছে।

দরজীর দল দিন রাত খেটে হুম্‌কার জন্যে ঝকমকে পোশাক তৈরি করেছে। তাছাড়া যুদ্ধের সৈনিকদের জন্যে পোশাক তৈরি করে প্রস্তুত হয়েই আছে। বুনোদের সর্দার এরই মধ্যে হাজার



হাজার বুনো মানুষ সংগ্রহ করে তাদের লড়ায়ের কাজে তৈরি করে ফেলেছে। ওদিকে তৈরি হয়েছে তীর-ধনুক বর্শা আরো সব হাতিয়ার। চারদিকে যেন সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে!

তুগ্‌গা টুনটুনী পাখী চারদিকে উড়ে উড়ে সব কিছু দেখে বেড়াচ্ছে। কোথায় কোন্ কাজের গাফিলতি হচ্ছে ঠিক নজর রাখছে।

তুর্গটাকে ভালো করে সাজিয়ে ফেলা হল।

কোথা থেকে তীরন্দাজরা তীর ছুঁড়বে তুর্গের আড়াল থেকে সে জায়গা ঠিক করা হল।

তুর্গের চারদিকে পরিখা খনন করা হল—যাতে শত্রুপক্ষ হঠাৎ তুর্গে এসে ঢুকতে না পারে—

ওদিকে—যে-সব সৈনিক তীর-ধনুক নিয়ে তৈরি হয়েছিল, তাদের যুদ্ধ জাহাজে চাপিয়ে নদী পথে রওনা করে দেওয়া হল—শত্রু পুরীর উদ্দেশ্যে।

এই তুর্গের যে-সব নামকরা সেনাপতি ছিল—তুগ্‌গা টুনটুনীর মুখে খবর পেয়ে তারাও এসে হাজির হল। কেউ গিয়ে তুর্গের দায়িত্ব নিলে, কেঁউ যুদ্ধ জাহাজে গিয়ে হুকুম চালাতে শুরু করে দিলে—

সমরপোতের ওপর তুর্গের রঙীন পতাকাগুলি পত্ পত্ করে উড়তে লাগলো। তুর্গেশের জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস একেবারে মুখরিত হয়ে উঠলো।

তুম্‌কা তখন তুগ্‌গা টুনটুনীকে কাঁধে নিয়ে একটা যুদ্ধ জাহাজে উঠে বসলো। সকলের সেরা যে সেনাপতি সে আদেশ দিলে—শত্রু-পক্ষ সচেতন হবার আগেই তাদের পুরী অধিকার করতে হবে।

পোতগুলো পত্ পত্ করে এগিয়ে চললো। শিঙ্গা বাজলো—দামামাধ্বনি হল—

গাঙচিলেরা পোতগুলির সঙ্গে সঙ্গে উড়ে চললো।

এই সমবেত আক্রমণ কোনো মতেই প্রতিরোধ করতে না পেরে শত্রুপক্ষ যুদ্ধে হেরে তাদের পুরী ছেড়ে বনের দিকে পালিয়ে গেল।

তুম্‌কার সেনাপতিরা সমগ্র শত্রুরাজ্য অধিকার করে বিপুল উল্লাসে নিজেদের তুর্গে ফিরে এলো।

নতুন ছুর্গ-অধিপতি আনন্দিত হয়ে যুদ্ধ বিজয়ের উৎসব করতে আদেশ দিলে।

সবাইকে পুরস্কৃত করা হল। যার যা পাওনা ছিল—সবাইকে মিটিয়ে দেয়া হল।

নতুন ছুর্গ-অধিপতি ছুম্‌কা, সেনাপতি আর মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে ছুইটি রাজ্যকে একসঙ্গে গড়ে তুলে নতুন শাসন-ব্যবস্থা চালু করলো।

যাতে গোটা রাজ্যের জমিতে ফসল উৎপন্ন হতে পারে সেজন্য প্রজাদের মধ্যে অর্থ বণ্টন করা হল।

ছুর্গের নীচে যে ঘড়া ঘড়া মোহর সঞ্চিত ছিল—ছুগ্‌গা টুনটুনীর পরামর্শে সেগুলি উদ্ধার করে রাজকোষে জমা করা হল।

এই রাজ্যের নৌকোগুলো দূর দূর অঞ্চলে বাণিজ্যের জন্য প্রেরণ করা হতে লাগলো।

রাজ্যের ব্যবসায়ী আর শিল্পীদের ডেকে—তাদের নতুন নতুন কাজে নিয়োজিত করা হতে লাগলো।

রাজ্যে নতুন পথ নির্মাণ, জলাশয় খনন আর ধর্মগোলা স্থাপনের ব্যবস্থা করা হল।

ইতিমধ্যে খবর পাওয়া গেল পাশের এক অঞ্চলে ছুভিক্ষ শুরু হয়ে গেছে। দলে দলে অনাহারী লোক ক্ষুধার জ্বালায় এই রাজ্যে এসে উপস্থিত হল।

ছুর্গ-অধিপতি ছুম্‌কা আদেশ দিলে—সবাইকে খাবার দাও। ধর্মগোলা খুলে দাও। এই রাজ্যে কেউ যেন অনাহারে না থাকে।

একদিন ছুগ্‌গা টুনটুনীপাখী এসে ছুম্‌কাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে বললে, দেখবে এসো, তোমার দাদারা ভিক্ষে করতে এসেছে।

ছুর্গের ওপর থেকে ছুম্‌কা ভাইদের ছুর্দশা দেখলে। সে নীচে নেমে এসে ভাইয়েদের সামনে দাঁড়ালো।

প্রথমে তারা ছুম্‌কাকে দেখে চিনতেই পারে না। ছুম্‌কা বললে,

তোমরা বড় ভাই হয়ে ছোট ভাইকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে। কিন্তু আমি ততটা নির্মম হবো না। তোমরা এখানেই থাকো। আমি তোমাদের আশ্রয় দেবো—

এইবার দাদারা তুম্‌কাকে চিনতে পারলে।

লজ্জায় মাথা নত ক'রে তারা ছোট ভাইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে রইল। তুগ গা টুনটুনী পাখী কিন্তু তখন আপন মনে হাসছে!

বাড়ীর ভেতরে কবর

সে অনেক কালের কাহিনী।

গল্পটা কিন্তু সত্যি।

লোকের মুখে মুখে চলে এসেছে।

আজ আমি তোমাদের সেই ভূতুড়ে কাহিনীটি শুনিয়ে দিচ্ছি।

ধরো, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলের কথা। এক ভদ্রলোক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিতে কাজ করতেন। তিনি কলকাতারই মানুষ। এই খানেই লেখাপড়া শিখেছেন। কোম্পানিতে চাকরি পেয়ে কলকাতার মানুষ কলকাতাতেই আছেন।

তাঁকে জীবনে কখনো কলকাতার বাইরে যেতে হয়নি। হঠাৎ তার বদলীর হুকুম এলো।

এই খবর শুনে নিবারণবাবুর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। তিনি এমনিতেই একটু ভীতু ধরনের মানুষ।

নিজের একটি ছোটখাটো বাড়ি আছে।

আরাম করে কোম্পানিতে চাকরি করেন।

অবসর সময়ে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে তাস-পাশা খেলে, যাত্রা দেখে সময় কাটে।

বাড়িতে বৌ আর কয়েকটি ছেলেমেয়ে। ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে, তাঁর আর কোনো ভাবনা নেই।

এই বদলীর হুকুম পেয়ে নিবারণবাবুর চোখের ঘুম দূর হয়ে গেল!

কি করে তিনি কলকাতা ছেড়ে অন্য জায়গায় যাবেন? কলকাতার বাড়িরই বা কি গতি হবে? ছেলেমেয়েদেরও ত সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

চাকরি করতে গেলে সুবিধে যেমন আছে, অসুবিধারও অভাব নেই।

এই বদলীর হুকুম পেয়ে মহা ভাবনায় পড়ে গেলেন নিবারণবাবু।

ধরো, তিনি বদলী হয়েছেন পাটনাতে। এখন তাকে সংসার আর লট-বহর নিয়ে সেই পাটনা শহরে ধাওয়া করতে হবে।

ভেবে ভেবে নিবারণবাবুর শরীর শুকিয়ে গেল। তাঁর ছেলে-মেয়েদের কিন্তু এই খবর পেয়ে ভারী আনন্দ হল। রেলগাড়ি চেপে যাবে,—নতুন জায়গা দেখতে পারবে, কত নতুন মানুষের সঙ্গে আলাপ হবে।

সে ভারী মজা হবে। ওরা সবাই মহা উল্লাসে লাফাতে শুরু করে দিল।

নিবারণবাবুর বৌ ভালও বলে না, মন্দও বলে না। শুধু একদিন বললে আমাদের পুরোনো বিশ্বাসী চাকর ভৈরবকে কিন্তু সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

ভৈরব সঙ্গে না থাকলে ছেলেমেয়েদের দেখবে কে? সংসারের ঝামেলাই বা কে পোয়াবে?

সুতরাং ঠিক হয়ে গেল—তাদের সঙ্গে ভৈরবও পাটনাতে যাবে—

নিবারণবাবু ভেবে সারা—দূর দেশে কাউকে জানেন না! বিদেশ বিভুঁইয়ে না জানি কী বিপদেই পড়বেন!

হঠাৎ নিবারণবাবুর মনে হল,—তাঁর সঙ্গে কলেজে মগনলাল নামে পাটনার একটি ছেলে পড়ত।

সেই মগনলালের সঙ্গে নিবারণবাবুর খুব ভাব হয়েছিল। মগনলাল তাঁকে বহুবার পাটনায় তার বাড়িতে যেতে নিমন্ত্রণ করেছে। কিন্তু কলকাতা ছেড়ে যেতে হবে ভেবে নিবারণবাবু একবারও তার প্রস্তাবে সায় দেন নি। তাছাড়া মগনলালের বাড়িতে কি খেতে দেবে—তার কিছু ঠিকঠিকানা নেই।

নিবারণবাবুর আবার ভাত ছাড়া একদিনও চলে না। তাই ভীতু

মানুষ নিবারণবাবু তাঁর ঘরের কোণ ছেড়ে দূরে যেতে কিছুতেই রাজী হন নি।

এইবার চাকরির দায়ে তাঁকে বেরুতেই হবে। অনেক ভেবেচিন্তে তিনি মগনলালকে একটি চিঠি লিখে বসলেন।

তাঁর বদলী হওয়ার খবর জানিয়ে, তিনি বন্ধু মগনলালকে একটি নিরিবিলি বাসা ভাড়া করার অনুরোধ জানিয়ে দিলেন। বাসাটি যেন নিরিবিলি হয়—আর আশে পাশে কোন ঝুট-ঝামেলা যেন না থাকে।

কয়েকদিন বাদেই মগনলালের কাছ থেকে চিঠি এসে গেল। মগনলাল ওখানে ভালো ব্যবসা করে। বন্ধুর পাটনাতে যাওয়ার খবর পেয়ে সে ভারী খুশী হয়েছে। একটি নির্জন পল্লীতে একটি ছোট-খাটো বাড়ি পাওয়া গেছে। সামনে ছোট ফুলের বাগান। বাঁধানো উঠোন, আর সুন্দর ইন্দারা আছে। মগনলাল সেই বাসা ঠিক করেছে।

মগনলালের কাছ থেকে খবর পেয়ে নিবারণবাবু অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন।

মগনলাল যেন মরুভূমির মধ্যে মরূদ্যানের সংবাদ বয়ে নিয়ে এলো।

বিদেশ বিভুঁইয়ে এই রকম একটি বন্ধু থাকলে আপদে-বিপদে অনেকটা নিশ্চিন্ত।

চেনা লোকের খবর পেয়ে নিবারণবাবু মালপত্রের বাঁধা-ছাঁদা শুরু করে দিলেন।

একটা শুভদিন দেখে নিবারণবাবু স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে ট্রেনে উঠে পড়লেন।

সঙ্গে লটবহর আর বিশ্বাসী পুরোনো ভৃত্য ভৈরব। কলকাতা থেকে রওনা হবার আগে নিবারণবাবু বন্ধু মগনলালকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিলেন, এবং তাকে স্টেশনে উপস্থিত থাকবার জন্যে বিশেষ করে অনুরোধ জানালেন।

যথাসময়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে নিবারণবাবু দেখতে পেলেন যে, মগনলাল ঠিক প্ল্যাটফর্মে হাজির আছে।

কতকাল পর দুই বন্ধুর দেখা হল।

দুই বন্ধু আনন্দে কোলাকুলি করলেন। মগনলাল কুলীদের সহায়তায় নিবারণবাবুর মালপত্রগুলি প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে ফেলল।

ভৃত্য ভৈরব সব জিনিসপত্র তড়িঘড়ি গুছিয়ে ফেলল।

একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে মগনলাল সবাইকে নিয়ে রওনা হল।

মগনলাল নিজে একটি সাইকেল চেপে এসেছিল। সে ঘোড়ার গাড়ির পাশে পাশে সাইকেল চালিয়ে দিল। নিবারণবাবু দেখলেন, মগনলাল ব্যবসা-বাণিজ্য করে বেশ শাঁসে-জলে মোটা হয়েছে।

সুন্দর ছোটখাটো ছবির মতো বাড়িখানি দেখে নিবারণবাবুর স্ত্রীর খুব পছন্দ হল।

ছেলেমেয়েরাও আনন্দে উঠোনে নাচতে শুরু করে দিলে।

ওরা জীবনে কখনো কলকাতার বাইরে আসেনি। তাই রেলে চড়ে আর নতুন জায়গা দেখে ওরাও খুব খুশী হয়ে উঠলো।

বাড়ির সামনেই সুন্দর একটি ফুলের বাগান। তাতে নানা রকম রঙীন ফুল ফুটে আছে।

বাড়ির উঠোনটা সান বাঁধানো।

এক পাশে একটি বড় ইন্দারা।

কপিকল দিয়ে দড়ি বেঁধে বালতি করে জল তুলতে হবে।

ওপরে নীচে ছয়খানি ঘর।

রঙ করা ছবির মতো বাড়িখানি।

বাড়ির গৃহিণী দেখে খুব খুশী হলেন।

মগনলাল ব্যবসায়ী মানুষ। তাই বন্ধুকে বাড়ির চাবি বুঝিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল। তার দাঁড়াবার সময় নেই।

বিদায় নেবার সময় জানিয়ে গেল, মাঝে মাঝে এসে খবর-বার্তা নিয়ে যাবে।

দুই দিন ধরে ক্রমাগত ওপর নীচ করে বাড়ির গিন্নী ভৃত্য ভৈরবের সাহায্যে মোটামুটি বাড়িখানি গুছিয়ে ফেলল।

বাড়ির কর্তা প্রত্যহ বাজার করে দিয়েই খালাস। পুরাতন ভৃত্য ভৈরব অসুরের মত জল তুলে, বাড়ি পরিষ্কার করে, রান্নাবান্না সেরে, মসলা পিষে, আসবাবপত্র সাজিয়ে, বিছানা পেতে বাড়িসুদ্ধু লোকের সেবা করতে লাগল। সে একাই একশ'। বাঁধানো উঠোনের এক পাশে একটি সুন্দর বেদী।

একটু উঁচু করে সান-বাঁধানো। দিব্যি মেটে রঙে পালিশ করা।

জায়গাটা দেখে ছেলেমেয়েদের ভারী পছন্দ হল। ওরা বললে, এইখানে তারা খেলাঘর পাতবে। ওরা সবাই মিলে বেশ সুন্দর করে বেদীটা সাজিয়ে ফেললে। ইটের টুকরো যোগাড় করে বাড়ি ঘরদোর তৈরি করলে। কিছু মাটি এনে দিব্যি বাগান সাজালে। সামনের বাগান থেকে রঙ-বেরঙের ফুল-পাতাটাতা এনে সেই বাগানের শোভা বাড়িয়ে দিলে। রোজ সন্ধ্যাবেলা এই বেদীর ওপর ওরা প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে প্রার্থনা করত। গান গাইত। আবৃত্তি করত।

কখনো-কখনো উৎসবের আয়োজন করে পুতুলের বিয়ে দিত।

এই ভাবে ছেলেমেয়েদের খেলাঘর বেশ জমে উঠল।

খেলাঘর সাজাবার কয়েক দিন পর থেকে ওরা লক্ষ্য করল,—সন্ধ্যাবেলা ছেলের দল যখন বেদীর ওপর প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রার্থনা করে সেই সময় মাঝে মাঝে এক ঠোঙা গরম হালুয়া, কিংবা গরম কচুরি, না হয় অনেকটা মিঠাই-মণ্ডা এসে হাজির হয়।

কে যে এই খাবার দিয়ে যায়—তা ছেলেমেয়েরা বুঝতে পারে না। হালুয়া আর কচুরি বেশ গরম থাকে। ওরা মজা করে সেই

সব খাবার খেয়ে নিয়ে আনন্দের সঙ্গে নাচ-গান করে। ওদের মনে কোনো 'কিন্তু' জাগে না!

একদিন কথায় কথায় এই রকম মজাদার খাবার আসার কথা ওরা ওদের মাকে বলে দিয়েছিল।

মা বললে খবরদার, এ রকম খাবার তোরা কখনো খাস নি। কে কোথা থেকে বাজে খাবার এনে রেখে যায়। সেই সব খেলে তোদের অসুখ করবে।

ছেলেমেয়েরা কিন্তু সে কথা শোনে নি। কারণ সেই খাবার-গুলো সত্যি ভালো, আর টাটকা ছিল। তা খেয়ে ওদের কখনো অসুখ করে নি।

একটা ব্যাপার ছেলেমেয়েদের খুব খারাপ লাগত।

ওদের মা মাঝে মাঝে দোতলার ঘর ঝাঁট দিয়ে সেই জঞ্জালগুলি বেদীর ওপর ফেলে দিত। এতে ওদের খেলাঘরের সাজানো নষ্ট হয়ে যেতো। ছেলেমেয়েরা মায়ের ওপর খুব বিরক্ত হত। আবার নতুন করে তাদের খেলাঘর সাজাতে হত।

এর মধ্যে একদিন একটা ভয়ংকর ঘটনা ঘটল। ঠিক বিকেলের মুখে—যাকে গোধূলি লগ্ন বলে। হলদে রঙে চারদিক ছেয়ে গেছে।

তখনো ঠিক সন্ধ্যে হয় নি।

বাড়ির গিন্নী দোতলা থেকে নেমে এলো। ইন্দারা থেকে এক বালতি জল তুলে নেবে।

খুব তাড়াতাড়ি দরকার। সেই মোটা দড়িটাতে বালতি বাঁধাই থাকে।

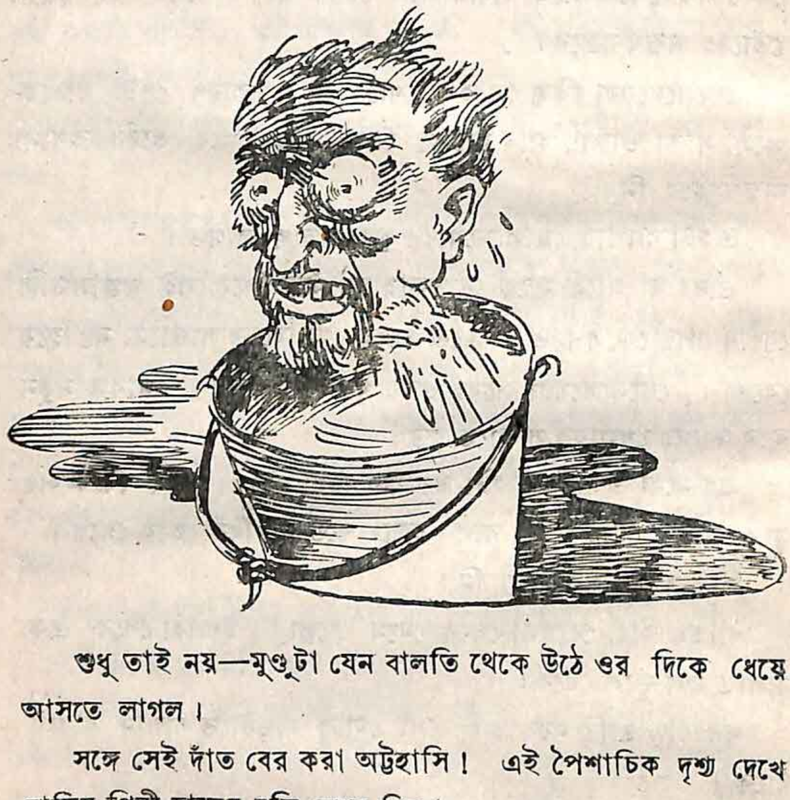
গিন্নী চটপট সেই বালতিটা নামিয়ে দিল ইন্দারার ভেতর। বালতিটা ভরে গেলে জল টেনে তুলতে লাগল। যখন মাঝামাঝি পথে বালতিটা উঠে এসেছে গিন্নী ইন্দারার ভেতর একবার তাকাল।

নীচের দিকে চাইবামাত্র গিন্নীর সারা শরীর ভয়ে রি-রি করে উঠল।

বালতির ভেতর জল কোথায়? এক বালতি ভরতি টাটকা তাজা রক্ত।

আর সেই রক্তের ভেতর ভাসছে একটি সদ্য কাটা মানুষের মাথা। লোকটার আবার ছাগুলে দাড়ি।

ওই সদ্য কাটা মাথাটা গিন্নীর দিকে তাকিয়ে হি-হি করে হাসছে।



শুধু তাই নয়—মুণ্ডুটা যেন বালতি থেকে উঠে ওর দিকে ধেয়ে আসতে লাগল।

সঙ্গে সেই দাঁত বের করা অট্টহাসি! এই পৈশাচিক দৃশ্য দেখে বাড়ির গিন্নী হাতের দড়ি ছেড়ে দিল।

তারপর মরিয়া হয়ে পালাতে গিয়ে উঠোনের সানের ওপর পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল।

ছেলেমেয়ের দল তাদের সেই বেদীর ওপর বসে খেলাঘর সাজাচ্ছিল

মাকে ওই ভাবে ছুটে পালিয়ে এসে অজ্ঞান হয়ে পড়তে দেখে—ওরা ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে কান্নাকাটি শুরু করে দিল।

ওদের পুরোনো চাকর ভৈরব কোথায় যেন কাজ করছিল।

ছেলেমেয়েদের চ্যাচামেচি শুনে সে ছুটতে ছুটতে সেইখানে এসে উপস্থিত হল।

গিন্নী কেন অজ্ঞান হয়ে পড়ল—ভৈরব তা কিছুই বুঝতে পারল না। তারপর সে ছুটল বাড়ির কর্তাকে খবর দিতে।

নিবারণবাবু এই দুঃসংবাদ শুনে একজন ডাক্তার ধরে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়িতে এসে পৌছুলেন।

গিন্নীর তখনো জ্ঞান ফিরে আসে নি। ডাক্তারবাবু অনেক চেষ্টা করলেন।

কিন্তু গিন্নীর জ্ঞান কিছুতেই ফিরে আসে না। তখন নিবারণবাবু ভৈরবকে ডেকে বললেন, শীগ্‌গির যা তো ভৈরব, মগনলালবাবুকে তাঁর গদি থেকে ডেকে নিয়ে আয়—! দেখি সে কোনো উপায় করতে পারে কিনা।

মগনলাল এসে সব কথা শুনে তার দোকানের একটি ছেলেকে পাঠিয়ে দিল।

সেই ছেলেটি গাড়ি ভাড়া করে একজন হাকিম ও একজন বুড়ো কবরেজকে ডেকে নিয়ে এলো।

তখন ডাক্তার, কবিরাজ ও হাকিম—এই তিনজন মিলে বহু রকম চেষ্টা করতে লাগলেন।

কিন্তু কিছুতেই বাড়ির গিন্নীর জ্ঞান ফিরে আসে না। কবরেজ-মশাই বললেন, রোগিণীর দাঁতে দাঁত লেগে গেছে—! নিশ্চয়ই কোনোরকম ভাবে ভয় পেয়েছেন।

মগনলাল তখন ব্যস্ত হয়ে বল্‌লে, তা হলে আমি গিয়ে একজন ওঝা ডেকে নিয়ে আসি। আমার জানা একজন বুড়ো আছে। সে নিশ্চয়ই নানা রকম মন্তর পড়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে পারবে।

ভৈরব কেবলই বরফের জন্যে ছুটোছুটি করতে লাগল।

সে রাত্তিরে আর বাড়িতে রান্নাবান্না কিছু হল না। ছেলে-মেয়েরা কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ল।

অনেক রাত্তিরে ওঝা এসে উপস্থিত হল।

তারপর বহু ঝাড়-ফুঁক, অনেক মন্তর পড়া, আগুন জ্বালিয়ে তাতে সরষে ছুঁড়ে মারা—বহুবিধ ব্যাপার ঘটল। শেষ রাত্তিরে রোগিণীর জ্ঞান ফিরে এলো।

কিন্তু তখন রোগিণী খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে! তাকে গরম দুধ খাইয়ে চুপচাপ একটা ঘরে শুইয়ে রাখা হল।

ভৈরবই কোনোরকমে বাজার রান্না শেষ করলে। ছেলে-মেয়েরা তাদের মায়ের কাছে যেতে পারলে না। আবার সন্ধ্যাবেলায় ওদের খেলাঘরে নানা রকম গরম খাবার এসে হাজির হল।

ছেলেমেয়ের দল মজা করে সেই সব খাবার খেয়ে নিল। গোটা বাড়িটা যেন চুপচাপ ঝিম মেরে পড়ে রইল। কেউ ভালো করে কথা বলতে পারে না।

সকলের মনেই যেন কিসের একটা আশঙ্কা! মনে হয় কী যেন ঘটবে···বাড়ির কর্তা নিবারণবাবু গভীর রাত্রে বিছানা থেকে উঠে আপনমনে ছাদে পায়চারি করেন।

নিশাচর পাখিগুলি মাথার উপর দিয়ে গভীর রাত্রে ডেকে চলে যায়—। মনে শিহরণ জাগে।

দূরে বনের প্রান্তে প্রহরে-প্রহরে শেয়াল ডেকে ওঠে···

কিসের অশুভ ছায়া যেন বাড়িটির ওপর পড়ে! নিবারণবাবু ভেবে ভেবে কোনো কূল-কিনারা পান না।

মগনলাল এসে বলে, নিবারণ ভাই, এই বাড়িতে একটা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করতে হবে। আমি ভালো পুরোহিত ডেকে নিয়ে আসব।

ইতিমধ্যে বাড়ির গিন্নী একটু সেরে উঠেছে। হাতে-পায়ে একটু জোর পেয়েছে। খাঁটি দুধ খেয়ে শরীরও বেশ সুস্থ হয়েছে।

ডাক্তার কবিরাজ বলেছে,—বেশী খাটাখাটনি চলবে না। হালকা কাজ একটু আধটু করতে পারে।

তারপর বেশ কয়েকদিন কেটে গেল। গিন্নীর মনের গ্লানিটাও দূর হয়েছে।

হঠাৎ এর মধ্যে আর একটি ঘটনা ঘটল। বাড়ির গিন্নী একতলা থেকে কি একটা খাবার হাতে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে যাচ্ছে—ঠিক সেই সময় দেখে ভৈরব দোতলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে একতলায় নেমে আসছে—

এমনভাবে ভৈরব হুড়মুড় করে নামছে যে, আর একটু হলেই সে গিন্নীমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল আর কি!

গিন্নী ভারী অবাক্ হয়ে গেল। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল, ভৈরবের চোখ দুটি একেবারে করঞ্জার মতো রাঙা!

ভৈরব অনেক কালের পুরোনো চাকর। তার এই রকম চলাফেরা হবে কেন?

লোকটি অত্যন্ত ভদ্র আর শান্তশিষ্ট। সে যে কোনো রকম নেশা করবে, কিংবা গিন্নীমার গায়ের ওপর এসে পড়তে যাবে—একথা গিন্নীমার কিছুতেই বিশ্বাস হল না।

দোতলায় গিয়ে গিন্নী দেখে, ভৈরব ঘরের ভেতর আপন মনে কাজ করছে। তাহলে দুম্ দুম্ করে তার পাশ দিয়ে নেমে গেল কে?

গিন্নীমা ভৈরবকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ওরে ভৈরব, তুই এই মাত্র সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলি?

ভৈরব অবাক্ হয়ে উত্তর দিলে, না গিন্নীমা, আমি ত ওপরেই কাজ করছি। আমি ত নীচে নেমে যাই নি।

তখন গিন্নীর মনে খট্কা লাগল। তাহলে এইমাত্র ভৈরবের বেশে কে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল?

গিন্নী যত ভাবে,—কিছুই ঠাহর করতে পারে না। নীচে নেমে

এদিকে লাটিম কয়েক বিঘা জমি লীজ নিয়ে, নারকেলডাঙ্গা অঞ্চলে মাদুলী তৈরীর কারখানাই খুলে বসেছে। দিনরাত লোক খাটছে সেই কারখানায়, তবু মাদুলী সাপ্লাই দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারছে না! মনে হচ্ছে গোটা দেশের লোকের জন্যেই মাদুলী চাই। কিন্তু সবচাইতে বিপদ হয়েছে জগদ্দলের! সারাক্ষণ তাকে ব্রহ্মচারী-সাধু সেজে বাঘের ছালের ওপর বসে থাকতে হয়, আর যত বেতো ঘেয়ো, আর আমাশার রোগীর বক্‌বক্ কথা শুনে জ্ঞানগর্ভ বাণী শোনাতে হয়। মানুষগুলোর ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে ওরা জগদ্দলের পায়ের মাংস অবধি খুবলে নেবে। কেন না পদধূলি আর এক-ফোঁটাও নেই—বেমালুম সাফ হয়ে গেছে।

এই সব দুঃখের কথা সে একদিন রাত্তিরে গোপনে গিয়ে পটকার আদর্শ হিন্দু হোটেলে সব খুলে বলে।

—আর আমি কিছুতেই ব্রহ্মচারী-সাধু সেজে দিনরাত বেতো রোগীর ব্যাজোর-ব্যাজোর শুনতে পারব না। তোরা আমায় রেহাই দে—

পটকা আঁতকে উঠে উত্তর দিলে, তুই বলছিস কি জগদ্দল? এমন চালু ব্যবসাটা মাটি করে দিবি?

—কিন্তু আমি সর্বক্ষণ পায়ের ধুলো কোথায় পাই বল? ওরা সবাই মিলে যে আমার পায়ের মাংস খুবলে নিচ্ছে।

পটকা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বল্লে, দি আইডিয়া। এই থেকে আমরা একটা সাইড্ বিজনেস করতে পারি। ব্রহ্মচারীর পদধূলি এক পুরিয়া চার আনা। যত রাজ্যের ধুলো প্যাকেটে বেঁধে রেখে দেবে। বসিয়ে দেব একজন জাঁদরেল চ্যালাকে। সে প্রতি পুরিয়া চার আনা করে বিক্রী করবে। চাই কি আমরা বিদেশেও রেজেষ্ট্রী যোগে পাঠাতে পারব এই ব্রহ্মচারীর পদধূলি! আর কথা বলিস্ নে। এমন চালু ব্যবসা মাটি করে দেবার কথা মনেও আনিস্ নে!

চাদরে মুখ ঢেকে রাত্তিরের অন্ধকারে জগদ্দল আবার নিজের আশ্রমে ফিরে এলো।

একদিকে যেমন তিন বন্ধুর স্বপ্নাদ্য মাদুলি প্রবল আলোড়ন আর জনসমাগমের সৃষ্টি করল অন্যদিকে ঠ্যাংপোতা গাঁয়ের প্রাত্যহিক জীবন যাত্রা সাধারণ লোকের পক্ষে একেবারে অসহনীয় হয়ে উঠল।

ছোট গাঁয়ের অল্প-পরিসরের হাট। সেখানে এসে জুটেছেন বালিগঞ্জের আধুনিকা তরুণীর দল, মধ্যবিত্ত পরিবারের বৌ-ঝিরা, পশ্চিম দেশীয় আর মাড়োয়ারী মেয়েরা……এ-ছাড়া আশে পাশের গাঁয়ের আবালবৃদ্ধ বনিতার আসা যাওয়ারও কামাই নেই। ছোট ছেলে-মেয়েরাই যে কত এসেছে তার লেখাজোখা নেই।

যে গাঁয়ে দুধ ছিল সস্তা সেখানে বাচ্চাদের জন্যে এক ফোঁটা দুধ জোগাড় করতে লোকে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে!

এ ছাড়া নেই চাল, নেই ডাল, তরিতরকারী! মাছ তো একেবারে প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী বলে পরিগণিত হয়েছে।

উপযুক্ত পায়খানার অভাবে গোটা পল্লীটা হয়ে উঠেছে একেবারে নরকের মত! সবাই নাকে কাপড় দিয়ে হাঁটছে তবু মিছিল করে লোক আসার কামাই নেই। এর আবার উল্টো দিককার ছবি আছে।

শহর অঞ্চলের কাগজে প্রত্যহ ব্রহ্মচারী-সাধুর ছবি আর তার বিচিত্র রোগ আরোগ্য করার কাহিনী সবিস্তারে প্রকাশিত হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে লোকের আগ্রহের ব্যারোমিটারও একধাপ থেকে আর এক ধাপ উঁচুতে উঠছে!

বিদেশ থেকে নিউজ এজেন্সীর প্রতিনিধিরা উড়ে আসছে বিমানে। তারা যে সব 'সন্দেশ' ফলাও করে এয়ারমেলে চালান করে দিচ্ছে তাতে গোটা দুনিয়াতেই একটা প্রকাণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করে ফেলেছে।

এই স্বপ্নাদ্য মাদুলী সম্পর্কে শিক্ষিত আর অশিক্ষিত মহলে এত বেশী গল্প ছড়িয়ে পড়েছে যে, কেউ যদি এর বিরুদ্ধে একটি কথা

ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁরে, তোরা ভৈরবকে নীচে দেখেছিস ?

তারা সবাই উত্তর দিলে, কৈ, না ত মা! এখানে আমরা নিজেরাই খেলা করছি।

বাড়ির গিন্নী এই ঘটনার কথাটা নিজের মনেই চেপে রাখলে। আর কাউকে কিচ্ছু বললে না।

পাছে বাড়ির কর্তাকে বললে তিনি আবার ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, তাই বাড়ির গিন্নী তাকেও কিছু জানাল না।

তারপর দিন এক রকম করে চলে যাচ্ছিল—ভৈরব নিজের কাজ করে চলেছিল, বাড়ির কর্তা যথারীতি অফিসে যাচ্ছিলেন, ছেলে-মেয়েরা তাদের খেলাঘরে নানা রকম খেলা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। বাড়ির গিন্নী এখন বেশ সেরে উঠেছেন। তিনিও ওপর-নীচ করে নিজের মনে কাজ করে যাচ্ছিলেন—

এমন সময় আবার এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল।

ঠিক সন্ধ্যের মুখটায়—

ওখানকার সব বাড়িতেই খাটা পায়খানা—বাড়ির গিন্নী এই সময়টায় গিয়ে পায়খানায় ঢুকেছেন—খাটা পায়খানাটা অনেকটা কুয়োর মতো দেখতে। বেশ অনেকটা গভীর।

হঠাৎ গিন্নী নীচের দিকে তাকিয়ে দেখে—কুয়োটা যেন একেবারে আলোময় হয়ে গেছে—আর নীচ থেকে একটা কাটা ছাগুলে দাড়ি-ওয়ালা মাথা সাঁ-সাঁ করে বিশ্রীভাবে হাসতে হাসতে ওপরে উঠে আসছে।

এই রকম একটা বীভৎস দৃশ্য দেখে গিন্নীর মাথা ঘুরে গেল।

সে তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠে বাইরে বেরিয়ে এলো।

তারপর হোঁচট খেয়ে সেই সান-বাঁধানো উঠোনে পড়ে আবার আগের মতো অজ্ঞান হয়ে গেল।

ভৈরব তখন আবার ছুটোছুটি শুরু করে দিল। আগে বাড়ির কর্তাকে খবর দিল।

তারপর কোথায় ডাক্তার—

কোথায় কোবরেজ—

কোথায় হাকিম—

সব খুঁজে বেড়াতে লাগল।

খবর পেয়ে মগনলালও এসে উপস্থিত হল।

সে ছুটল ওঝাকে ডেকে নিয়ে আসতে—তারপর সবাই মিলে সমবেতভাবে চেষ্টা করতে লাগল।

কিন্তু গিন্নীর জ্ঞান আর ফিরে আসে না!

বাড়িতে ছেলেমেয়েদের মরাকান্না শুরু হয়ে গেল। তারা মাকে ওইরকম ভাবে পড়ে থাকতে দেখে বাবাকে ঘিরে চ্যাচামেচি আরম্ভ করে দিলে। এই সব গোলমাল শুনে—পাড়ার এক বুড়ো মৌলভী এসে হাজির হলেন।

মৌলভী নিবারণবাবু আর মগনলালকে একান্তে ডেকে নিয়ে বললেন, বাবু, তোমাদের আমি পরামর্শ দিচ্ছি, এই বাড়ি তোমরা ছেড়ে দাও—

নিবারণবাবু অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, আপনি এই বাড়ি ছেড়ে দিতে বলছেন কেন? বাড়ির কি কোনো দোষ আছে?

মৌলভী সায়েব তাঁর পাকা দাঁড়িতে হাত বুলিয়ে উত্তর দিলেন, ঠিক ওই কথাই আমি বলতে চাইছি বাবু। এই বাড়িতে জীন বাস করে। তাছাড়া আপনাদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের মুখে আমি যে সব কথা শুনেছি তাতে বুঝতে পেরেছি—ওই জীনটা এ বাড়িতে আপনাদের টিঁকতে দেবে না।

এই কথা শুনে নিবারণবাবু ভয় পেয়ে বললেন, এই বাড়িতে ভূত আছে? কিন্তু আমি ত কোনো দিন কিছু দেখতে পাই নি।

মৌলভী সায়েব উত্তর দিলেন, তাহলে সব ব্যাপারটা আপনাদের খুলেই বলি বাবু—

এই বাড়িতে দুই মুসলমান ভাই থাকত। তাদেরই বাড়ি। ওরা তামাক পাতার ব্যবসা করত। বেশ অবস্থা ভালো ছিল দুই ভায়ের। এক সঙ্গেই ব্যবসা করত; আর দুই ভায়ের খুব মিলমিশ ছিল।

একদিন ব্যবসায়ের টাকাকড়ি নিয়ে দুই ভায়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হল। কথা কাটাকাটি থেকে মারামারি। তারপর এক বাড়িতে থেকেও দুই ভায়ের মধ্যে কথা বন্ধ হয়ে গেল। কেউ কারো মুখ দেখতে চায় না। শেষকালে একদিন গভীর রাত্রে ছোট ভাই বড় ভাইয়ের মুণ্ডু কেটে ফেলে ওই ইন্দারার মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

একটু চুপ করে থেকে মৌলভী সায়েব বললেন, ওই যে আপনারা উঠোনের এক ধারে বাঁধানো বেদী দেখছেন, যেখানে ছেলেমেয়েরা খেলাঘর পেতেছে,—ওইটি হচ্ছে বড় ভাইয়ের কবর। ছেলেমেয়েরা ওখানটা ফুল দিয়ে সাজায়, সাঁঝের বেলা ওখানে চেরাগ জ্বালিয়ে দেয়,—তাই বড় ভাইয়ের জীন খুব খুশী হয়ে বাল-বাচ্চাদের হালুয়া খাওয়ায়,—গরম কচুরি খাওয়ায়, আর লাড্ডু-মণ্ডা এনে দেয়। আর বাড়ির বিবি ওই কবরের ওপর জঞ্জাল ফেলে বলে জীনের ভারী গোসা হয়েছে। তাই সে নানাভাবে এই বাড়ির বিবিকে ভয় দেখাচ্ছে।

আপনারা এক কাজ করুন,—এই বাড়ি ছেড়ে চলে যান,—তাহলেই বিবির সব ব্যামো ভালো হয়ে যাবে। আপনারা আর দেরি করবেন না। একটি নতুন বাড়ি দেখে চলে যান, তা হলেই জীনের আর কোনো উপদ্রব হবে না॥

———

খোদনের খ্যাতিলাভ

ইস্কুলের পড়া তৈরি করবে কি, খোদনের রাত দিন শুধু ওই এক চিন্তা—কি করে খ্যাতি লাভ করা যায়।

সারা কাগজে কত লোকের নাম ছাপা হয়, কত মানুষের কত ছবি ওঠে,

কত লোকের প্রশংসায় দলে দলে মানুষ পাগল হয়ে ওঠে—

কত অভিনেতার অভিনয় দেখে 'হল' ভর্তি লোক হাততালি দিয়ে পায়রা উড়িয়ে দেয়—কিন্তু আফসোসের কথা, খোদনের দিকে কারো নজর নেই!

আচ্ছা, তোমরাই বলো, খোদন কি একটা ফ্যালনা লোক? ওকি শুধু একটা ফালতু বাঁশের টুকরো? রাশি রাশি লোকের খ্যাতির আড়ালে ওর কি কোনো মূল্যই নেই!

খোদন কি অজানাদের আড়ালে একেবারে হারিয়ে যাবে? খোদন যত ভাবে, তত আশেপাশের লোকেদের ওপর চটে যায়, বিরক্ত হয়, আর দিনরাত অসোয়াস্তি অনুভব করে।

ওদের ইস্কুলের মাস্টারমশাইরা পাঠ্যপুস্তকের কতকগুলি কথা 'আণ্ডার লাইন' করে দেন। কথাগুলি নাকি ভারী দামী। পরীক্ষায় আসতে পারে।

সেই রকম খোদনের নামটা রাতারাতি দামী হয়ে উঠতে পারে না? সবাইকার মুখে মুখে ফিরবে খোদনের নাম! সবাই হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে বলবে, হ্যাঁ, খোদন খ্যাতিলাভ করেছে বটে! সবাই তার নামটা নিয়ে লোফালোফি করছে!

এই ত কিছুদিন আগেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের সঙ্গে ভারতের রবার নিয়ে কী রগড়া-রগড়ি! কাগজে-কাগজে নাম ছাপা হল!

ফটোতে ফটোতে পাতা ভরতি হয়ে উঠল। রেডিওতে চললো নানা নামের ধারাবিবরণী।

একটা দিনের জন্যেও কি খোদনের নামটা সবাইকার জপমালা হয়ে উঠতে পারে না! খোদন কেবলি ভাবে, কিন্তু কোনো পথ খুঁজে পায় না!

ওর জন্মদিনে পিসেমশাই একটা সুন্দর ছুরি উপহার দিয়েছিল। একদিন সেইটে পকেটে নিয়ে খোদন ইস্কুলে গিয়ে হাজির হল! হঠাৎ তার মগজে বিদ্যুতের ঝিলিকের মত একটা বুদ্ধি খেলে গেল। এই ছুরি দিয়ে টেবিলে, চেয়ারে, ব্ল্যাকবোর্ডে নিজের নাম খোদাই করে রাখতে পারে! তা হলে রোজ সবাইকার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করবে ওর নাম!

যে কথা সেই কাজ!

টিফিনের ঘণ্টায় ছেলের দল যখন টিফিনের খাবার খেতে ব্যস্ত, সেই সময় খোদন তার নতুন ছুরি বাগিয়ে ধরে 'খোদন' নাম খোদাই করে ফেললে ডেস্কে, টেবিলে, চেয়ারে, ব্ল্যাক-বোর্ডে আর দরজায়।

সেদিন হয়তো বিশেষ কেউ লক্ষ্য করেনি তার হাতের কাজ! পরদিন হেডমাস্টারমশায়ের ঘরে তার ডাক পড়ল।

হেডমাস্টারমশাই গম্ভীর গলায় হাঁক দিলেন, তুমি কি অপারেশন করার ডাক্তার? সব জায়গায় ছুরি চালিয়েছ? ইস্কুলের সম্পত্তি নষ্ট করার জন্য তোমার দশ টাকা জরিমানা হল।

মাথা নীচু করে খোদন ফিরে এলো। নাঃ, খ্যাতিলাভের পথ মোটেই খোলসা নয়। নিশ্চয়ই ক্লাসের 'মনিটর'টা ওর নামে হেডমাস্টারের কাছে নালিশ জানিয়েছে। এখন এই দশটি টাকা সে কি করে যোগাড় করে? একমাত্র ঠাকুমার মালাজপের থলেই ভরসা!

ইতিহাস পড়তে পড়তে খোদন আপন মনে ভাবে—কত রাজা, বাদ্‌শা, সেনাপতি দেশ জয় করেছে, কত কবি নানা ছন্দে কাব্য রচনা

করেছে, কত শিল্পী নানা রঙের অনবদ্য ছবি এঁকেছে, কত ভাস্কর বিচিত্র সব মূর্তি তৈরি করেছে, কত নাবিক অজানা দেশ আবিষ্কার করেছে, কত গায়ক গান গেয়ে মানুষের অন্তর জয় করেছে। তাদের সবাইকার জীবনী ওদের পাঠ্যপুস্তক থেকে মুখস্থ করতে হয়! খোদনের নামটা কি এই তালিকায় কোনমতেই কায়দা করে ঢুকিয়ে দেয়া যায় না?

ভেবে ভেবে খোদন মাথার চুল ছেঁড়ে, কিন্তু কোন উপায় খুঁজে পায় না।

অনেক ভেবে চিন্তে খোদন ঠিক করলো, সহজ উপায় হচ্ছে তাড়াতাড়ি গান শিখে নেয়া!

ওর দিদি বেশ গান গাইতে পারে। সব বাড়িতেই তার আদর। আত্মীয়-স্বজনরা তাকে খাতির করে নিজেদের বাড়ি নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যায়। কত গানের আসর থেকে তার ডাক আসে। বহু সংগীত-সম্মেলনে তাকে গাইতে হয়। পাড়ার রবীন্দ্র-জয়ন্তী আর সরস্বতী পুজোর আসরে তার কত খাতির! এছাড়া রেডিওতেও সে মাঝে মাঝে গান করে। শোনা যাচ্ছে, দিদির গান নাকি রেকর্ড করা হবে। এই জন্যে দিদির ওপর খোদনের মাঝে মাঝে হিংসে হয় বৈকি!

খোদন তাই আপন মনে ঠিক করলে, দিদির চাইতেও নাম করবে। কাকামণির একটা গীটার আছে—গভীর রাত্রে আপন মনে বাজায়। অনেক রাত্তিরে সেই গীটারের বাজনা শুনতে শুনতে খোদন ঘুমিয়ে পড়ে।

খোদন তাই ঠিক করলে, গোপনে গীটার বাজনা শিখতে হবে।

একদিন ইস্কুল থেকে ফিরে কাকামণির ঘরে উঁকি মেরে দেখলে, কেউ কোথাও নেই! মা-কাকীমা-দিদি ওরা সব রান্নাঘরে খাবার করতে ব্যস্ত। ঝি-চাকরেরা যে যার কাজ নিয়ে আছে। এই ত গীটার শেখবার উপযুক্ত অবসর। কাকামণির ঘরে ঢুকে খোদন আস্তে আস্তে

দরজাটা বন্ধ করে দিলে। দেয়ালে গীটারটা ঝুলছিল। সেইটে নামিয়ে নিয়ে আপন মনে বাজাতে শুরু করে দিলো। হঠাৎ খটাং করে গীটারের কি যেন ছিঁড়ে গেল।

এখন উপায় ?

তাড়াতাড়ি গীটারটাকে আবার দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখলে। কিন্তু সেদিন একটু বেশী রাত্তিরে বাড়িতে হইচই পড়ে গেল। কাকামণির এত সাধের গীটারের এমন অবস্থা কে করলে ?

আসল অপরাধী যে কে, সেটা খুঁজে বের করতে বাড়ির লোকের বিলম্ব হলো না। কাকামণি এমনিতেই একটু রগচটা মানুষ। তার শখের বাদ্যযন্ত্রের এই অবস্থা। কাকামণি এগিয়ে এসে খোদনকে এই মারে ত' এই মারে! শেষকালে কাকীমা ছুটে এসে ওকে কোন রকমে বাঁচায়। বলে, রক্ষে কর খোদন, আর তোকে বাজনা শিখতে হবে না। আমি তোকে সুন্দর ছবি আঁকা শেখাবো।

ছবি আঁকা ? খোদন উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

কাকীমার কাছ থেকে ভাল করে ছবি আঁকা শিখে নিতে হবে। সুতরাং একটা শুভদিন দেখে শুরু হলো খোদনের শিল্পচর্চা।

কাকীমা বেশ মন দিয়েই খোদনকে ছবি আঁকা শেখাতে লাগলো!

প্রথমে পেন্সিলে ড্রইং করা, তারপর রঙীন পেন্সিলে মজাদার ছবি আঁকা, এরপর প্যাস্টেলে মানুষের মুখ আঁকা।

শুরু হলো জলরঙ দিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকা!

খোদনও বেশ মজা পেয়ে গেল ছবি আঁকার ব্যাপারে।

নানা জাতের ছবি আঁকা শুরু করে দিলে খোদন। যাকে বলে, ছবিতে ছবিতে ধূল-পরিমাণ।

কত রকমের কাগজ যে এলো ছবি আঁকবার জন্যে, তার হিসেব করা শক্ত। পাতলা কাগজ, মোটা কাগজ, রঙীন কাগজ, তুলোট

কাগজ—তুলির টানে রকমারী সব ছবি তৈরি হতে থাকল। ঠাকুমা বললে, আমায় একখানা লক্ষ্মীর পট এঁকে দিস খোদন, ঠাকুরঘরে টাঙিয়ে রাখবো। দাদু কইলে, খোদন, আমায় একটা বিদ্যাসাগরের ছবি এঁকে দিস। মানুষ তো ওই একটাই। শিয়রে ঝুলিয়ে রেখে দেবো। মা বললে, ওরে খোদন, আমাকে শ্রীরামকৃষ্ণ আর শ্রীশ্রীমার ছবি বড় করে এঁকে দিস। যাতে ঘুম থেকে উঠেই ওঁদের দেখতে পারি। দুজনকে প্রণাম করে সংসারের কাজে লাগতে পারি।

খোদন কাউকেই নিরাশ করে না। বড় বড় করে ছবি আঁকে। সব ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে দেয়।

সেদিন ছোট ভাইয়ের আবদার। দুই বেড়ালের ঝগড়া এঁকে দিতে হবে।

তাদের ইস্কুলে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হবে! দুই বেড়ালের ঝগড়ার ছবি সেইখানে ঝুলিয়ে দিতে হবে। কিন্তু ছোট ভাইয়ের আবদার রাখতে গিয়ে কাগজ নিয়ে মুশকিলে পড়ল খোদন। সারা বাড়িতে একটা মোটা কাগজ মিলছে না। এ ঘর দেখে, সে ঘরে খোঁজে! একটা মনের মত মোটা কাগজ পায় না।

অবশেষে খোদন গিয়ে ঢুকলো তার বাবার বৈঠকখানায়।

বাবা নামকরা উকিল। তাঁর দেরাজে নানা রকম মোটা কাগজ রোল করা থাকে। তার থেকে একটা ভারি মোটা কাগজ নিয়ে খোদন পালিয়ে এলো নিজের ঘরে।

দুই বেড়ালের ঝগড়া ছবিটা প্রায় অর্ধেক আঁকা হয়েছে, এমন সময় নীচের বৈঠকখানায় দারুণ শোরগোল শোনা গেল।

মক্কেল এসে বসে আছে। একটা মোটা দামী কাগজ পাওয়া যাচ্ছে না! তাতে কী নাকি উইল লেখা হবে। সেই জন্যে আগে থেকে দামী কাগজটা যোগাড় করে রাখা হয়েছে।

হঠাৎ কে যেন গিয়ে খবর দিলো, আমাদের খোদন একটা মোটা কাগজে "দুই বেড়ালের ঝগড়া" আঁকছে। পর মুহূর্তেই

সিঁড়িতে চটির ফটফট শব্দ শোনা গেল। কে যে এসে খোদনের কান পাকড়ে ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল, সেটা জানা গেল অনেক পরে।

খোদনের মন-মেজাজ একেবারে খিঁচড়ে গেল। পরে সে খবর পেলে, যার জন্যে সে ছবি আঁকছে, সেই মূর্তিমান ভাইটিই নীচে গিয়ে এক ফাঁকে খবরটি দিয়ে এসেছে।

যার জন্যে করি চুরি—সেই বলে চোর!

সুতরাং খোদন ছেড়ে দিলো পথটা, বদলে গেল মতটা!

এরপর খোদন অনেক গবেষণা করে ঠিক করলে, নিজের পাড়াতে একটা সমিতি গড়ে তুলবে, আর তাতে ধুম করে সরস্বতী পুজো করবে।

পুজোর জন্যে পাড়ার ছেলেদের দলে টেনে নিলে। চাঁদার রশিদ বই ছাপান হলো। অনেক টাকা চাঁদা তোলা হলো, কুমোর-টুলিতে ফরমাস দিয়ে নতুন ধরনের মূর্তি তৈরি করা হলো। পাড়ার খোলা মাঠে প্যাণ্ডেল বাঁধা হলো, মঞ্চ সাজান হলো, পুরোহিত ঠিক করা হলো। নৈবেদ্য ও ভোগের আয়োজন করা হলো।

খোদন বললে, না খেয়ে থাকতে হবে অঞ্জলি দেবার জন্য। যারা আগেই কুল খেয়ে নিয়েছে, তাদের নাম কিন্তু অঞ্জলি দেবার তালিকা থেকে বাদ পড়ে গেল।

ছেলেমেয়েরা সবাই ভোরে স্নান করে পুজোর ফুল যোগাড়ে মেতে উঠলো।

এদিকে বেলা বেড়ে যায়। পুরোহিত ঠাকুর আর আসে না। ধীরে ধীরে অঞ্জলি দেবার লোকের সংখ্যা কমতে লাগলো। খিদের ঠেলায় সবাই বাড়ির দিকে পোঁ-পোঁ দৌড়!

খোদন হুমকি দিয়ে বললে, কেউ না থাকে, আমি উপোস করে থাকবো। সমিতির হয়ে আমি একাই অঞ্জলি দেবো।

বেলা চারটেয় যখন পুরোহিতের দেখা পাওয়া গেল, তখন খোদনকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

খোদন কোথায়, খোদন?

চারদিকে খোঁজ খোঁজ রব উঠলো। একদল ছেলে গিয়ে দেখে, খোদন প্রতিমার পেছন দিকে লুকিয়ে গপাগপ প্রসাদ চুরি করে খাচ্ছে!

সেই থেকে ছেলে-মহলে খোদনের খ্যাতি রটে গেল—"অনশনশ্রী খোদন!"

যে করে হোক, অবশেষে খোদন খ্যাতিলাভ করেছে!!

খোদনের স্বপ্ন-সঞ্চরণ

খোদনের এক নতুন রোগ দেখা দিয়েছে।

গভীর রাত্রে বাড়ীসুদ্ধ সবাই যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে, সেই সময় যেন কার ডাকে খোদন বিছানা থেকে উঠে পড়ে—তারপর সেই ঘুমন্ত অবস্থাতেই চলতে সুরু করে দেয়।

ঘরের খিল সেই চোখ-বন্ধ অবস্থাতেই খুলে ফেলে। তারপর আপন মনে হাঁটতে থাকে।

কখনো উঠোন পেরিয়ে, ধানের মরাই এড়িয়ে, ফলের বাগান পেরিয়ে, একেবারে বড় পুকুরের ধারে হাজির হয়।

একদিন নাকি ঘাটলা বেয়ে জলের ধার অবধি গিয়েছিল।

পুকুরে নেমে সাঁতার কাটতে সুরু করতো কিনা তাই বা কে জানে! এক চাষী কুটুম বাড়ী ফেরার পথে গভীর রাত হয়ে যাওয়ায় ওই ঘাটলায় বসে আপন মনে চিড়ে-গুড় চিবুচ্ছিল। সে খোদনের ব্যাপার দেখে একেবারে হক্‌চকিয়ে যায়। খোদনকে সে চিনতো।

অত রাত্তিরে খোদন যখন ঘুমুতে-ঘুমুতে পুকুরের সিঁড়ি দিয়ে নামছিল, তখন সেই দিকে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ায় চাষীটার চিঁড়ে-গুড় চিবোনো বন্ধ হয়ে যায়।

ম্লান জ্যোছনার আলোকে সব কিছুই চোখে পড়ছিল। চাষীটা কিছুতেই বুঝতে পারছিল না, খোদন চোখ বন্ধ করে ঘুমুতে ঘুমুতে ঘাটলার সিঁড়ি বেয়ে কোথায় নেমে যাচ্ছে।

এই রকম কাণ্ড চোখের ওপর দেখেও কি চিঁড়ে চিবুনো চলে? কাজেই চাষীটার চোয়াল প্রায় আটকে যাবার দাখিল!

প্রথমে সে একবার খোদনের নাম ধরে ডাক্‌লো।

কিন্তু যে মানুষ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পথ চলে—এক ডাকে সাড়া দেবার পাত্র সে নয়।

কাজেই খোদন আগের মতোই সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে লাগ্‌ল। ফলে চাষীটার চিঁড়ে-গুড় চিবুনো বন্ধ হয়ে গেল।

সে ছুটে গিয়ে খোদনের হাতটা জড়িয়ে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে খোদনের ঘুম ভেঙে গেল।

সে চোখ চেয়ে আঁৎকে উঠে বললে, একি! আমি কোথায়?

চাষীটি বল্‌লে, আরে খোদনবাবু, তুমি তো পুকুরে সাঁতার দিতে যাচ্ছিলে। শুধু গামছাটা আনতে ভুলে গেছ। তাই তো আমি তোমায় ডাক্‌লাম।

খোদনের চোখ ছুটো বড় বড় হয়ে উঠল।

সে মাথা নেড়ে বললে, অ্যাঁ! আমি সাঁতার কাটতে যাচ্ছিলাম!

গামছা আনতে বেমালুম ভুলে গেছি। এই নিশুতি রাতে আমি একা একা বাড়ী ফিরবো কি করে?

চাষী উত্তর দিলে, আমি মেয়ের ব্যামোর খবর পেয়ে কুটুমবাড়ী গিয়েছিলাম তাকে দেখতে। ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। অনেক পথ এখনো বাকি। কুটুম বাড়ী থেকে গামছায় চিঁড়ে-গুড় বেঁধে দিয়েছিল। ঘাটালায় বসে এতক্ষণ তাই চিবুচ্ছিলাম।

হঠাৎ জ্যোছনায় তাকিয়ে দেখি, তুমি ঘুমুতে ঘুমুতে এই ঘাটলা



ধরে নেমে যাচ্ছ। তোমার বোধ করি এত রাত্তিরে সাঁতার কাটবার বাসনা হয়েছে। কিন্তু কাঁধে তোমার গামছা নেই।

তাই তো ছুটে গিয়ে তোমার হাত পাকৃড়ে ধরলাম। গামছা না থাকলে শক্ত করে কোমর বাঁধবে কি করে? জলে নেমে মহা মুস্কিলে পড়ে যাবে। তাই তো তোমার হাত ধরে ডাক্‌লাম—

কী সর্বনাশ! গামছা আনা হয়নি বলে আমার এত রাত্তিরে সাঁতার কাটা হয়নি! তা'হলে তুমি বসে বসে চিঁড়ে গুড় চিবুবে?

চাষী উত্তর দিলে, তা চিবুতে হবে বৈকি বাবু! সেই কুটুম বাড়ী থেকে এতটা পথ হেঁটে এসেছি। আবার অনেকটা পথ চলতে হবে। এই পুকুরটার জল বড় মিঠে, চিঁড়ে-গুড় চিবিয়ে দু'আঁজলা জল খেয়ে প্রাণডা বড় ঠাণ্ডা হবে। এখন তুমি বাড়ী যাও—গামছাডা নিয়ে এসো—

খোদনের চোখ ততক্ষণে ছানাবড়া হয়ে উঠেছে—

—ওরে বাবা! আবার গামছা এনে এত রাত্তিরে সাঁতার কাটতে বলছে যে!

খোদন তখন প্রাণের ভয়ে বাড়ীর দিকে ছুট লাগালো।

আর এক দিনের ঘটনা।

সেদিন বাড়ীতে খুব ঘটা।

খোদনের ঠাকুর্দা ৮০ বছরে পা দিয়েছেন।

তাই এক কড়াই-ভর্তি পরমান্ন হয়েছে।

আর এক কড়াই উপছে পড়ছে ছানার পান্তুয়া।

আর শুধু কি বাড়ীর লোক?

আসুন জন—বসুন জন, যারা এসেছে কেউ বাদ যায়নি।

ক্ষেতে-খামারে যারা কাজ করে, তাদেরও কলাপাতা করে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দেয়া হয়েছে।

তবু অনেক খাবার বেঁচে গেছে।

পরদিন বাসি পায়েস-পিঠে বাড়ীর লোকে খাবে বলে যত্ন করে ঢেকে রাখা হয়েছে।

বাড়ীর লোক সবাই তো পরিশ্রান্ত ছিল—

তাই বিছানায় পড়েছে, আর মরেছে!

গভীর রাত।

গোয়াল ঘরের গাইগুলো অবধি ডাঁশের কামড়ে হাম্লাচ্ছে না! বাড়ীর পোষা কুকুর বাঘা—তার তো সারা বাড়ী ঘুরে ঘুরে পাহারা দেবার কথা। তারও এই নিশুতি রাতে কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না!

ঠাকুর্দা মাঝে মাঝে উঠে গুড়ুক-গুড়ুক তামাক টানে। আজ তার ঘর থেকেও খুট্‌খাট্ শব্দ শোনা যাচ্ছে না!

গুড়ুক-গুড়ুক তামাক টানার শব্দও নেই!

ঠাকুমা মাঝ-রাত্তিরে মাঝে মাঝে উঠে পান ছেঁচে খায়! তার সেই ছোট্ট হামানদিস্তেরও ঠুন্‌ঠান্ আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না!

সবাই ভরপেট পায়েস আর পান্তুয়া খেয়ে যেন ভোঁস্ ভোঁস্ করে নাক ডাকাচ্ছে—

রাত্তিরে পোষা টিয়াটা মাঝে মাঝে আচম্‌কা ডেকে ওঠে! আজ সেও ঝিমিয়ে রয়েছে।

সে তো আর পায়েস আর পান্তুয়া খায়নি!

সে এমন চুপচাপ কেন?

ঝিম্‌ঝিমে রাত্তির!

থম্‌থমে আকাশ!

গাছের একটি পাতাও নড়ছে না···প্রহরে প্রহরে বনের ধারে যে শেয়াল ডাকে, তাদেরও সংগীত শোনা যাচ্ছে না। সমবেত নিশাচর রাত-পাখীরাও ভুল করে এই বাড়ীর ওপর দিয়ে ডেকে যাচ্ছে না!

এমন সময় খুট্ করে একটা শব্দ হ'ল।

তাতে বাঘার ঘুম ভাঙল না···গোয়াল ঘরে গাই-গরুরা হাম্‌লালো না···টিয়েটা খাঁচার ভেতর একবারও ডেকে উঠল না!

বাড়ীর চাকরটা বুঝি একবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল।

খোদনের ঘর থেকেই খুট্ করে আওয়াজ হ'ল। তারপর ঘরের খিল্ খোলার শব্দ…ঘুমুতে ঘুমুতে খোদন বেরিয়ে এলো!

ওর দুই চোখ বন্ধ, কিন্তু দিব্যি হেঁটে চলেছে!

এবার কিন্তু বাড়ীর বাইরের দিকে ওর পা চল্‌ছে না। সটান চলে গেল খোদন রান্নাঘরের দিকে।

বাইরে একটা শিকল লাগানো ছিল।

কোনো তালা আট্‌কানো ছিল না সেই শিকলে।

ঝন্ করে একটা শব্দ হ'ল, তারপর দরজাটা দিব্যি খুলে গেল। খোদন অন্ধকারের ভেতরই সেই ঘরে ঢুকে গেল।

আলো জ্বালাবার দরকার নেই!

কোথায় পায়েস আর পান্তুয়া ঢাকা আছে, দিব্যি খোদনের ডান হাত সেই দিকে চলে গেল।

আপন মনে আয়েস করে পায়েস খেতে লাগল খোদন।

চোখ দুটো তেমনি ধ্যানী বুদ্ধের মতো বোজা!

যখন ভোগের কাজ আধাআধি শেষ হয়েছে, এমন সময় বাড়ীর অন্নদা ঝি একবার বাইরে বেরিয়ে এলো।

হঠাৎ তার নজর গেল রান্নাঘরের দরজার দিকে।

এ কী! রান্নাঘরের দুটি দরজা যে একেবারে হাট্-পাট্ খোলা!

অথচ ভেতর থেকে চপ্ চপ্ শব্দ বেরুচ্ছে!

রান্নাঘরে কোনো কুকুর ঢুকে পড়ল নাকি!

অন্নদা ঝি আবার ভেবে দেখলে, কুকুর কি করে শিকল খুলবে?

ভয়ে-ভয়ে এক'পা-দু'পা করে এগিয়ে গেল অন্নদা ঝি—চোর ঢোকেনি তো রান্নাঘরে?

বাইরের জান্‌লাটা খোলা ছিল। ভেতরে খানিকটা জ্যোছনা এসে পড়েছে। সেই জ্যোছনায় অন্নদা ঝি দেখলে, উবু হয়ে বসে খোদন পায়েস আর পান্তুয়া খাচ্ছে।

একেবারে অবাক কাণ্ড!

অন্নদা ঝি একেবারে কাছে গিয়ে দেখল, খোদনের দু'চোখ দিব্যি বন্ধ!

ঘুমুতে ঘুমুতে পিঠে পায়েস খাচ্ছে খোদন!

তখন অন্নদা ঝি পা টিপে টিপে গিয়ে সবাইকে ডেকে নিয়ে এলো। বাড়ীসুদ্ধ সবাই এসে রান্নাঘরের সামনে ভিড় জমালো।

তখনো খোদন চোখ বুজে পিঠে-পায়েস খেয়ে চলেছে। ঠাকুমা বল্‌লে, এ কি কাণ্ড! পেটের অসুখে ভুগছে বলে আমি বেশী পায়েস ওকে দিইনি! এখন এই রাত-দুপুরে উঠে সমানে পিঠে পায়েস খেয়ে চলেছে!

পিসীমা এগিয়ে এসে ফোড়ন কাট্‌লেন, ওকি জেগে আছে? ও যে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পিঠে পায়েস খাচ্ছে।...

তখন সবাই খোদনের মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, তাই তো! তাই তো! তাই তো!

তখন সকলে ধরাধরি করে ওকে বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলে।

এইবার খোদনের বুঝি ঘুম ভেঙে গেল।

খোদন চোখ মেলে হঠাৎ আঁৎকে উঠে জিজ্ঞেস করলে—

—আমি কোথায়?

পরদিন পাড়ার প্রবীণ ডাক্তারদের ডেকে আনা হ'ল—

এলেন বিচক্ষণ এলোপ্যাথিক ডাক্তার, এলেন ত্রিকালজ্ঞ কবিরাজ মশাই, এলেন পাশের পাড়ার হাকিম সায়েব—এলেন অভিজ্ঞ প্রবীণ হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক—

সবাই মিলে তখন শলা-পরামর্শ সুরু করে দিলেন।

বাড়ীর সকলে মহা চিন্তিত।

খোদনের কি অসুখ করেছে?

চার মাথা একসঙ্গে বহুক্ষণ ধরে আলোচনা করে স্থির করলেন, 'সাম্‌নাম্‌ বুলিজম'।

অত বড় নাম শুনে বাড়ীর সবাই ঘাবড়ে গেল।

সবাই শুধোলে, অত বড় অসুখ ? আমাদের খোদন বাঁচবে তো ?

চিকিৎসকেরা জবাব দিলেন, বাঁচবে না মানে ? পূজোর সময় ড্যাং ড্যাং করে ঘুরে ঠাকুর দেখতে পারবে—

ঠাকুমা এইবার এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, ও ডাক্তারবাবুরা, আমার নাতির কি ব্যামো হয়েছে—একটু বাংলা করে বলো না, আমরা একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

এলোপ্যাথিক ডাক্তার গম্ভীর গলায় উত্তর দিলেন, একে বলে 'স্বপ্ন-সঞ্চরণ'।

পিসীমা আঁৎকে উঠে বললেন, স্বপ্ন-সঞ্চরণ! সেটা আবার কি অসুখ ? ভালো করে বুঝিয়ে বলো ডাক্তারবাবুরা—

ত্রিকালজ্ঞ কবিরাজ মশাই এইবার ভালো করে বুঝিয়ে দিতে এগিয়ে এলেন। বললেন, শোনো মা, এটা একটা পুরোনো দিনের ব্যাধি। কবিরাজী শাস্ত্রে এর উল্লেখ আছে। এটা হচ্ছে ঘুমের মধ্যে বেড়ানো। শুদ্ধ বাংলায় এই রোগটাকে বলে, স্বপ্ন-সঞ্চরণ! নিজের অজান্তে স্বপ্নের ভেতর ঘুরে বেড়ানো!

এলোপ্যাথিক ডাক্তার আবার স্থানীয় হাসপাতালের সঙ্গে জড়িত। তিনি পরামর্শ দিলেন, রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে 'অবজারভেশনে' রাখতে হবে।

অন্নদা ঝি আঁৎকে উঠে বললে, অমন শক্ত শক্ত কথা কয়োনা ডাক্তারবাবুরা। বাছাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে মারধোর করবে না তো ?

ডাক্তারবাবুরা অন্নদা ঝির কথা শুনে হো-হো করে হেসে উঠ্লেন। বললেন, হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে রোগীকে বুঝি মারধোর করে ? একথা তুমি কার কাছে শুনেছ ঝি ?

অন্নদা ঝি চোখে আঁচল দিয়ে উত্তর দিলে, আমার ক্যাবলার বাপকে তো সবাই জোর জবরদস্তি করে হাসপাতালে ভর্তি করে

দিলে, তারপর সেইখানে মারধোর খেয়েই তো বেচারী মরে গেল! আর আমার কাছে ফিরে এলো না—

ডাক্তারবাবু বললেন, না-না, সে সব কিছু নয়। নিশ্চয় তোমার স্বামীর কঠিন ব্যায়রাম হয়েছিল। চিকিৎসা করে হয়ত তাকে বাঁচানো যায় নি। তাকে হাসপাতালে মারধোর করা হয়েছিল, একথা একেবারে মিথ্যে।

ডাক্তারবাবু আবার বুঝিয়ে বললেন, হাসপাতালে কোনো অযত্ন করা হবে না। ওকে 'অবজারভেশনে' রাখা হবে, মানে ডাক্তারদের নজরে রাখা হবে। রোগের কি-কি লক্ষণ, সব দেখা হবে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে, তারপর চিকিৎসা করে সেই অসুখ সারিয়ে দেয়া হবে।

তখন বাড়ীসুদ্ধ সবাই হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচল। ডাক্তারবাবুরা আরো এক দফা পরামর্শ করে খোদনকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়াই স্থির করলেন।

কাকাদের সঙ্গে গিয়ে তখন খোদন হাসপাতালে ভর্তি হ'ল।

গভীর রাত হাসপাতাল সুদ্ধু সবাই ঘুমুচ্ছে।

দূরে থানার পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে তুটো বাজল। রাত্রের নার্স কিছুক্ষণ আগে টহল দিয়ে গেছে।

হাসপাতালের দাই আর চাকরের দল সেই সন্ধ্যে থেকে বারান্দায় বসে গুজুর-গুজুর করছিল, আর ক্রমাগত পান চিবুচ্ছিল।

এখন তারাও নিজের নিজের গামছা পেতে বারান্দার এ-কোণে ও-কোণে ভোঁস্ ভোঁস্ করে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছিল।

হাসপাতালের একটা নিজস্ব ঘোড়ার গাড়ী আছে। ডাক্তার-বাবুরা অনেক সময় সেই গাড়ী করেই বেরোয়।

এতক্ষণ ধরে সেই ঘোড়ার নালের ঠক্-ঠক্ শব্দ নীচে শোনা যাচ্ছিল।

এইবার সেই শব্দও নীরব হয়ে গেছে।

এ-ঘরে ও-ঘরে কয়েকজন মরণাপন্ন রোগী রোগের যন্ত্রণায় কাত্‌রাচ্ছিল। এখন তারাও একেবারে চুপচাপ।

মনে হয় তাদেরও রোগ-যন্ত্রণা সাময়িক ভাবে সেরে গেছে। হাসপাতালের মাথার ওপর দিয়ে একটা নিশাচর পাখী কুক্‌-কুক্‌ শব্দ করতে করতে উড়ে গেল।

আর কোথাও কোনো জীবনের সাড়া খুঁজে পাওয়া গেল না।

এমন সময় খোদন ধীরে ধীরে উঠে বস্‌ল।

কিছুদিন থেকে সে বড় অশান্তিতে কাটাচ্ছে। দীর্ঘকাল ধরে পেটের অসুখে ভুগ্‌ছে বলে—ঠাকুমা, পিসীমা, মা, দিদিরা কেউ তাকে মনোমত খাবার খেতে দেয় না।

শুধু শিঙি-মাছের ঝোল, আর ভাত এ ছাড়া ছ'বেলা বার্লি আর ছানার জল। এই খেয়ে লোকে দিনের পর দিন থাকতে পারে? রাত্তিরে তার ঘুম আসে না! তাই তো এই অদ্ভুত রোগ!

খোদন ধীরে ধীরে তার বিছানা থেকে নেমে এলো। সারাদিন ধরে কোন্‌ রোগীর কোন্‌ 'মিট্‌সেফে' কি খাবার আর ফল-ফুলারি রাখা হয়েছে, সে বিশেষ মনোযোগ দিয়ে নিরীক্ষণ করেছে।

এইবার সে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে এগোলো। কোনো মিট্‌সেফ থেকে কুড়িয়ে নিল পাকা মর্তমান কলা, কোথা থেকে আপেল আর আঙুর। আবার কোনো মিট্‌সেফ থেকে এক বাক্স টাট্‌কা সন্দেশ তুলে নিল।

আস্তে আস্তে পা-টিপে-টিপে সে সিঁড়ির কাছে এগিয়ে গেল।

চারদিকে একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখল।

একজন রোগী সারা সন্ধ্যে একটি গোয়েন্দা-কাহিনী পড়ছিল। এখন দেখা গেল, সেই বইটি রোগীর হাত থেকে পড়ে মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। দক্ষিণের হাওয়ায় সেই গোয়েন্দা-কাহিনীর পাতাগুলো ফর্‌ফর্‌ করে উড়ছে।

খোদন অন্যান্য সওদার সঙ্গে সেই বইটিও সংগ্রহ করে নিল।

তারপর অতি ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল।

পরদিন সকালবেলা—ডাক্তারবাবু যখন খোদনের বাসায় গিয়ে তার খোঁজ করছিলেন, তখন সে তার বিছানায় শুয়ে ভোঁস-ভোঁস করে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছিল।

ডাক্তারবাবু আস্তে আস্তে তাকে ডেকে তুলে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি?

খোদন চোখ কচলে উত্তর দিলে, স্বপ্ন-সঞ্চরণ !!

স্বপ্নাদ্য মাদুলী

শ্যামবাজারের গলির মোড়ের এক ছোট চায়ের দোকানে বসে তিন বন্ধু হাফ্‌কাপ চা নিয়ে মৃদুস্বরে কথাবার্তা বলছিল।

সেই সকাল থেকে তারা তিনজনে এসে দোকানের একটি বেঞ্চ অধিকার করে বসেছে, আর ওঠবার নাম নেই। দোকানের মালিক তিন-চারবার বাঁকা এবং ক্রুদ্ধ চোখে ওদের দিকে তাকিয়েছে। অতীত ভারতের ভস্ম করার কসরতটা অনেকেরই আওতার মধ্যে ছিল। কিন্তু ইদানীং গুরুমন্ত্র লোকে বেমালুম ভুলে গেছে! নইলে এতক্ষণ এই তিন ছোকরা কখন সিগারেটের ছাই হয়ে কলকাতার ফুটপাতে উড়ে বেড়াত।

হাফ্‌কাপ চা নিয়ে এতক্ষণ ধরে দোকানের জায়গা আটকে রাখলে দোকানদারের সমূহ ক্ষতি। কিন্তু মুখফুটে সে কিছু বলতেও পারেনা। কেননা, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও এই তিন ছোকরার পরনে রয়েছে—এ, আর, পি-র পোশাক! ওদের উঠতে বলে কি বিপদ ডেকে আনবে চায়ের দোকানের মালিক? হয়তো রাতারাতি ঘরই জ্বালিয়ে দেবে। কিংবা বোমা।

তিন বন্ধুর প্রথম জনের নাম পটকা। সে যখন কথা বলে, মনে হয় শ্যামাপূজাতে কেউ পট্‌কা ছুড়ছে। দ্বিতীয় বন্ধুর নাদুস্ নুদুস্ গোলগাল চেহারা, আর দেহের সঙ্গে সমতা বজায় রেখে একটু ধীর স্থির, কথাও বলে গুণে গুণে। এর নাম হচ্ছে জগদ্দল! জগদ্দল পাথরের মতোই একে নড়ান শক্ত। একবার ভাল হয়ে চেপে বসলে একে ওঠায় কার সাধ্যি! তৃতীয় বন্ধুর নাম হচ্ছে লাটিম। দিনরাত কেবল কাজ আর অকাজ নিয়ে ব্যস্ত। আর সেই কাজ আর অকাজের গোলক ধাঁধায় কেবল লাটিমের মতো ঘুরছে।

এখন তিন বন্ধু পট্‌কা, জগদ্দল আর লাটিম দিশেহারা কি করে তাদের দিন যাবে।

এ, আর, পি-র চাকরির মেয়াদ তো শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এন্তার সিনেমা দেখা, রেস্টুরেন্টে বসে চপ-কাটলেট ওড়ানো, আর যখন তখন দামী সিগারেট বের করে ধোঁয়ার কুণ্ডলী সৃষ্টি। এর কোনটাই এখন চলবেনা!

বন্ধুমহলে যে খাতির আর প্রতিপত্তি ছিল, তা যদি হঠাৎ একদিন কর্পূরের মতো উড়ে যায়……তবে প্রাণ থাকা আর না থাকা দুই-ই সমান।

পট্‌কা-জগদ্দল-লাটিম ক্রমাগত শিবনেত্র করে ভাবে আর লম্বা লম্বা নিঃশ্বাস ছাড়ে। কিন্তু হাফ্‌-কাপ চা নিয়েই বা দোকানের জায়গা আর কতক্ষণ আট্‌কে রাখা যায়? এর ওপর ছারপোকার উপদ্রবও আছে চায়ের দোকানের বেঞ্চে। জগদ্দল বল্লে চল ভাই, এখানে সুবিধে হচ্ছেনা। রেস্টুরেন্ট গুলো থেকে আমাদের খাতির চলে গেছে। তার চাইতে সোজা হেদোতে গিয়ে বসবি চল।

হ্যাঁ, যা বলেছিস! ঘাসের ওপর দিব্যি পা ছড়িয়ে দেওয়া যাবে। টিপ্পুনী কেটে বল্লে পট্‌কা।

তিনবন্ধু হাফ্‌-কাপের দাম চুকিয়ে দিয়ে নীরবে ফুটপাত ধরে হাঁটা শুরু করে দিলে। হেদোর পরিচিত ঘরোয়া পরিবেশে সবাই হাত-পা ছড়িয়ে বসলো। জগদ্দল গম্ভীর গলায় বল্লে, বিদেশী সিগারেট খাওয়া ঠিক নয়। আমার সঙ্গে দেশী বিড়ি আছে। চমৎকার মশলা দিয়ে তৈরী। দুটান মেরে দেখ মগজে দিব্যি বুদ্ধি খেলবে। যুদ্ধের বাজারে এই প্রস্তাব উত্থাপন করলে অন্য দুই বন্ধু চাঁটি মেরে তার মগজের ঘিলুকে সেক্‌ দি বটল করে দিত। কিন্তু এখন কেউ কোন আপত্তি উত্থাপন করলো না। একবার পরস্পর মুখের দিকে তাকিয়ে নীরবে ধূমপান করতে লাগলো। বিড়ি টানতে টানতে পট্‌কা হেদুয়ার জলের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

রাস্তার গ্যাসের আলো জলের মধ্যে কেঁপে কেঁপে ভেঙ্গে ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে। সেই দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে পট্‌কার যেন দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল।

সে হঠাৎ আধপোড়া বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সগর্বে ঘোষণা করলে, হয়ে গেছে—

জগদ্দল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে, হয়ে গেছে? কি হয়ে গেছে? লাটিম ফোড়ন কাটলে, আমাদের সুখের পায়রাদের সুখের দিন শেষ হয়ে গেছে—সেই কথাই কি বলতে চাইছিস?

আবার যেন একটা পট্‌কা ছুঁড়ে দিয়ে পট্‌কা উত্তর দিলে, মোটেই তা নয়। সত্যিকারের সুখের দিন আমাদের আস্‌ছে, আর তারই প্ল্যান তৈরী হয়ে গেছে। গম্ভীর কণ্ঠে জগদ্দল শুধোলে, তা প্ল্যানটা কি আমরা সুস্থির হয়ে শুনতে পাইনে?

পট্‌কা বল্লে, কালকেই তোকে ঠ্যাংপোতা গাঁয়ে চলে যেতে হবে। জগদ্দল যেন বিশ বাঁও জলের তলায় পড়ে যায়।

—অ্যাঁ! ঠ্যাংপোতা?……আমি?……সে কি!

পট্‌কা বিজ্ঞের মত উত্তর দিলে, তোর কোন ভয় নেই। আমার এক দিদিমা সেখানে থাকে। বিরাশী বছরের পাকা থুথুরে বুড়ী…কানে কম শোনে…চোখেও কম দেখে। সেজন্য তোর কোন ভাবনা নেই। আমি আর লাটিম রওনা হব দিন কয়েক পর।

জগদ্দল আবার ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন তোলে, অ্যাঁ! ঠ্যাংপোতা গ্রাম? সেখানে আমার কোন্ কম্ম? এই দিব্যি কলকাতা শহর ছেড়ে ঠ্যাংপোতা গাঁয়ে! তবে কি আর প্রাণে বাঁচবো?

—বাঁচবার জন্যেই তো এই প্ল্যান। হুঙ্কার দিয়ে উঠল পট্‌কা।

—কি করবো আমি সেই অজ পাড়াগাঁয়ে গিয়ে?

—স্বপ্ন দেখতে হবে। স্বপ্নাদ্য মাদুলী

—পটকা তার মূল্যবান মত প্রকাশ করে।

—যুদ্ধের পর এখন ঐটের চাহিদাই তো বাজারে বেশী হবে।

জগদ্দল এইবার হেদোর নরম ঘাসের ওপর তার বিরাট বপু এলিয়ে দেয়।

—অ্যাঁ। স্বপ্ন? স্বপ্নাদ্য মাদুলী? তা স্বপ্নই যদি দেখতে হয় তো সেই ঠ্যাংপোতা গাঁয়ে কেন? কলকাতায় কি সুন্দর স্বপ্ন দেখা যায় না? সিনেমা-ঘরের রঙিন ছবির মতো—লালচে, মিঠে, টক-টক-নোন্তা আর ঝাল স্বপ্ন? যদি বলিস্ তো আজকেই একবার চেষ্টা করে দেখি।

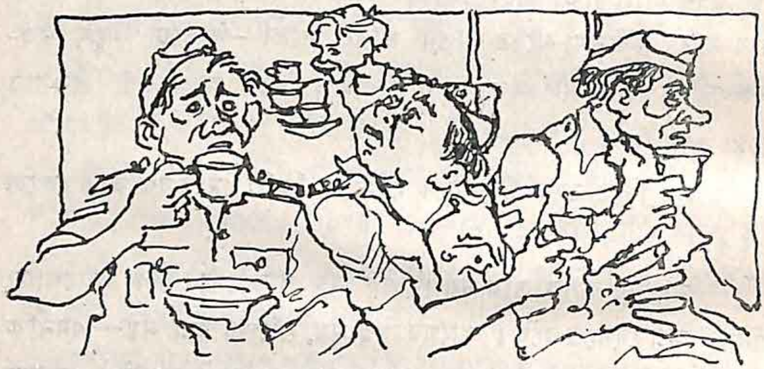
হুঙ্কার দিয়ে তার উচ্ছ্বাসকে বোতলে ছিপি মেরে বন্ধ করে ফেলে পট্কা।

—না, না, কলকাতায় নয়! ওই অজ পাড়াগেঁয়ে ঠিক ঠ্যাংপোতা গাঁয়েই স্বপ্ন দেখতে হবে। বাঘের স্বপ্ন নয়, সাপের স্বপ্ন নয়—এমনকি ভূতের স্বপ্নও নয়। দেখতে হবে অব্যর্থ স্বপ্নাদ্য মাদুলীর ছবি। দেখতে হবে এমন জায়গায় যেখানে শহুরে বাবুরা হুট করে গিয়ে পৌঁছুতে পারে না। একেবারে দুর্গমগিরি-কান্তারমরু পেরিয়ে যেখানে শুধু গরুর গাড়ীই চলে। নইলে লোকের বিশ্বাস হবে কেন? আর সত্যি কথা বলতে কি, বিশ্বাস নিয়েই তো ব্যবসা। যাকে লোকে বলে—"গুড উইল।"

এতগুলি কথা একসঙ্গে বলে উত্তেজনায় পট্কা হাঁপাতে লাগলো।

জগদ্দল ভয়ে ভয়ে উঠে বসলো বন্ধুর বক্তৃতা শুনে। তবু মন রাখবার জন্যে মৃদুকণ্ঠে বল্লে তা না হয় স্বপ্ন দেখছি! কিন্তু তোরা আমাকে একা একা যেতে বলছিস কেন—সেই ধ্যাদ্দেড়ে গোবিন্দ-পুরে? তোরাও না হয় সঙ্গে চল্। পট্কা মাথা দুলিয়ে উত্তর দিলে, উঁহু! একসঙ্গে গেলে কাজ হবে না। তুই আগে গিয়ে ওখানে স্বপ্ন দেখবি, তারপর আমরা কাগজে কাগজে সেই অলৌকিক ঘটনা ছাপিয়ে দেবো, তবে না দেশের লোক জানতে পারবে সেই স্বপ্নাদ্য মাদুলীর কাহিনী।

এই বার জগদ্দলের পাথরের মত মোটা পুরু ঠোঁটেতে হাসি জেগে উঠলো। সে মাথায় আঙ্গুল চালিয়ে বল্লে, হ্যাঁ, এতক্ষণে বুঝতে-পেরেছি। এদেশে স্বপ্নাদ্য মাদুলী ছাড়া আর কোন উপায়



নেই। এই ঘটনার দিন সাতেক বাদেই বিভিন্ন দৈনিকে নিজস্ব সংবাদদাতার খবর প্রকাশিত হল—

স্বপ্নে মহাদেবের মাদুলী দান

সর্বরোগ নিরাময়ের অলৌকিক কাহিনী

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ঠ্যাংপোতা গ্রাম হইতে সম্প্রতি এক অলৌকিক সংবাদ আসিয়াছে। জগদ্দল জোয়ারদার নামে এক সর্বসুলক্ষণযুক্ত যুবক এক চতুর্দশী রাত্রে স্বপ্ন দেখে স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব তাহার শিয়রে উপস্থিত হইয়া বলে, বৎস, পৃথিবী বর্তমানে রোগে আর শোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তজ্জন্য তোমাকে একটি মাদুলী আমি প্রদান করিতেছি। এই মাদুলী ধারণ করিলে সর্ব-রোগ নিরাময় হইবে। তোমাকে সর্বসুলক্ষণযুক্ত কুমার বিবেচনা করিয়া এই মাদুলী তোমার হস্তেই প্রদান করিতেছি এবং ইহার নির্মাণবিধি শিক্ষা দিতেছি। এই বলিয়া তিনি উক্ত ব্রহ্মচারী যুবকের হস্তে একটি মাদুলী অর্পণ করিয়া সহসা অদৃশ্য হইয়া যান।

নিদ্রাভঙ্গে যুবক আশ্চর্য হইয়া দেখে যে, সত্যসত্যই তাহার হাতে একটি তাম্রনির্মিত মাদুলী রহিয়াছে।

এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া অন্ধ, আতুর, বাতের রোগী, হাঁপানি, কাশি, আমাশায়, অম্লশূল, যক্ষ্মা, উদরাময়ে যাহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া ভুগিতেছে তাহাদের ভিড়ে যুবকের গৃহ প্রাঙ্গণ পূর্ণ হইয়া যায়। আরও বিস্ময়ের কথা উক্ত ব্রতধারী ব্রহ্মচারী যুবক মাদুলীস্পর্শে সকলের দীর্ঘকালের ব্যাধি দূর করে! দুইজন জন্মান্ধ নাকি তাহাদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইয়া ব্রহ্মচারীকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করে। এক জমিদারের মায়ের দীর্ঘকালের হাঁপানি সারিয়া গিয়াছে বলিয়া তিনি উক্ত স্থানে একটি পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা ও তাহার পাড়ে একটি মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু করিয়াছেন।

বিভিন্ন অঞ্চল হইতে দলে দলে লোক মিছিল করিয়া এই গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইতেছে। এজন্য এখানে বিশেষ খাদ্যাভাব ঘটিয়াছে।

এই খবরটি বিভিন্ন সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হলে সারা দেশময় একটা আলোড়নের সৃষ্টি হল।

যেখানে যত পুরোনো ব্যাধির রোগী জীবনের আশা ছেড়ে দিয়ে হা-হুতাশ করছিল আর বৈতরণী পার হবার কথা ভাবছিল—তারা সবাই উৎসাহে শয্যার ওপর উঠে বসল। বিভিন্ন অঞ্চলের ডাক্তাররা নিজেদের হাত কামড়াতে শুরু করে দিলে। বহু অভিজ্ঞ চিকিৎসকের ডাক্তারখানার দরজা বন্ধ করে দিতে হল!

লোক ছুটতে লাগলো উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম অঞ্চল থেকে ওই ঠ্যাংপোতা গাঁয়ের দিকে। কেউ ট্রেনে, কেউ মোটরে, কেউ গোরুর গাড়ীতে—আবার কেউবা জলপথে নৌকায়।

পটকা আর লাটিম এখন লাটিমের মতই বন্ বন্ করে ঘুরছে। পটকা একজন ধনী মাড়োয়ারীর অংশীদার হয়ে ঠ্যাংপোতা গাঁয়ে 'আদর্শ হিন্দুহোটেল' খুলে বসেছে, আর রাশি রাশি গোরুরগাড়ী জুটিয়ে ভাড়া খাটাচ্ছে।

উচ্চারণ করেছে তাকে সঙ্গে সঙ্গে প্রহারেণ ধনঞ্জয় হতে হচ্ছে! ফলে অবিশ্বাসীদের বিপদ বেড়ে গেছে।

জগদ্দল সাধু হয়ে আটকা আছে বটে, কিন্তু আর দুটি বন্ধুর উদ্যমে এতটুকু ভাঁটা পড়েনি! তারা স্বর্গ-মর্ত রসাতল চ্‌ষে ফেলেছে। ফলে প্রশংসাপত্রও পাওয়া যাচ্ছে প্রচুর। রাজ্যপাল, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার, সাহিত্যিক, কবি, শিল্পী, গায়ক, খেলোয়াড় সবাই লম্বা লম্বা প্রশংসাপত্র লিখে দিচ্ছেন। তাই ছাপা হচ্ছে হাজারে হাজারে। জনসাধারণ সেই সব প্রশংসাপত্র পড়ে আরো দলভারী করে রওনা হচ্ছে ঠ্যাংপোতা গাঁয়ের উদ্দেশে। আবার ব্রহ্মচারী-সাধুর ছবি তুলে তাই আর্ট পেপারে ছাপিয়ে দু' আনা করে বিক্রী হচ্ছে। তাতেই যে কত টাকা জলের মত আসছে হিসেব রাখা শক্ত।

ইতিমধ্যে কোন এক ভক্ত রটিয়ে দিয়েছে যে, ব্রহ্মচারী-সাধুর একগাছা চুল সংগ্রহ করে যদি বাড়ীতে রাখা যায় তবে সেগৃহে আর কখনো কোন ব্যাধি হবে না।

জগদ্দলের পক্ষে এর ফল বিষময় হয়ে উঠেছে। এরপর থেকে রাত্তিরে সে নিশ্চিন্তে ঘুমুতেও পারে না। ওৎপেতে থাকে যেন নিশাচর পেচকের দল। একটু চোখ লেগেছে—অমনি কয়েকটি অদৃশ্য হাত মাথা থেকে চুল ছিড়ে নিতে শুরু করে। যে সব ভক্তরা ওকে পাহারা দেয় তারাই যে একাজে অগ্রণী এ কথা বুঝতে জগদ্দলের দেরী হয় না।

হায়! হায়! হায়! কি কুক্ষণেই সে ব্রহ্মচারী সাজতে রাজি হয়েছিল! ভেবেছিল আর ছুটোছুটি করতে হবে না। গদিতে বসে তাকিয়ে ঠেসান দিয়ে দিন গুজরান করবে, আর ঘি, দুধ, হালুয়া, মালপো প্রচুর খাবে।

পট্‌কার ব্যবস্থাপনায় খেতে অবশ্য প্রচুরই পাচ্ছে। কিন্তু দিনে-রাতে তার এতটুকু বিশ্রাম নেই। সারাদিন ক্রমাগত রোগীদের সঙ্গে ঘ্যান-ঘ্যান করো···আর রাত্তিরে একটু আরাম করে ঘুমুবে—তারও যো নেই।

এমন করে প্রত্যহ চুল ছিঁড়লে মানুষ নিশ্চিন্তে কখনো ঘুমুতে পারে? একেই বুঝি বলে, বুকের ওপর বসে দাঁড়ি ওপড়ানো।

আর কিছুদিন এইভাবে কাটলে সে বুঝি সত্যি পাগল হয়ে যাবে! তখন তার আর দুই বন্ধু যে তাকে পাগলাগারদে পাঠিয়ে দেবে না সে বিষয়ে কোনো কথাই হলফ করে বলা চলে না।

মোদ্দা জগদ্দল কেবল ভাবে আর ঘামে।

হঠাৎ ইতিমধ্যে নাটকের চরম-মুহূর্ত এসে উপস্থিত হল। অব্যবস্থা, অনিয়ম আর স্বাস্থ্য-বিরোধী দিন যাপনের ফলে ঠ্যাংপোতা গ্রামে ও আশেপাশে কলেরা রোগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ল।

মানুষ মরতে লাগল পোকার মত। কিন্তু এমনি মজা যে, তবু দলে দলে লোক আসার কামাই নেই।

এই সব কাণ্ড দেখে সরকার শঙ্কিত হয়ে ঠ্যাংপোতা গ্রামে যাবার টিকিট বন্ধ করে দিলেন। ওখানে কিংবা আশেপাশের কোনো স্টেশনেই ট্রেন থামবে না। তাতেও নিস্তার নেই।

হাঁটা পথে আর নৌকায় তবু ক্রমাগত মিছিল এগিয়ে যেতে লাগলো। তখন সরকার বাধ্য হয়ে নাটেরগুরু জগদ্দলকে গ্রেপ্তার করলেন।

খবর পেয়ে বন্ধুরা ছুটে এল। জামিনের জন্যে তদ্বির করতে লাগলো। কিন্তু কিছুতেই জামিন পাওয়া গেল না।

কোর্টে দাঁড়িয়ে জগদ্দল হুঙ্কার দিয়ে বল্লে, খবরদার যে কেউ আমার জন্যে জামিনের তদ্বির করবে, তাকে আমি খুন করব। পুলিস যে আমার কি উপকার করেছে তা আমিই জানি! নাছোড়বান্দা ভক্তদলের হাত থেকে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে ওরাই। এইবার জেলে গিয়ে আমি নিশ্চিন্তে ঘুমুতে চাই।

এই বলে সে প্রকাণ্ড হাই তুলে ডান হাতে তুড়ি মারতে লাগলো।

আসামী পক্ষের উকিলের মুখে আর বাক্যি নেই।

আপন মনে থাকতে যে চাই

খোদনের মনে এক এক সময় এক এক রকম বাসনা জাগে।

খোদন যে ঘরে থাকে সেই ঘরেই পড়াশোনা করে, আর পড়তে পড়তে সেই ঘরেই ঘুমিয়ে পড়ে।

ওর একদল পোষা প্রাণী আছে। অবসর সময়ে তাদের নিয়েই দিব্যি কেটে যায় খোদনের।

ওর এক টিয়া আছে, সে নানারকম কথা বলে। আছে এক সাদা ধবধবে বেড়াল, তার নাম 'তুলতুলে'। খোদনের এক পোষা কুকুর আছে, তার নাম ও রেখেছে 'দস্যি'।

ওর জন্মদিনে ওর এক জ্যাঠামশাই ওকে এক ছোট্ট বানর উপহার দিয়েছিলেন। খোদন তার নাম দিয়েছে 'চটপটি'। আর ওর ঘরের দেয়ালে আছে এক টিক্‌টিকি। সেও তার পোষা প্রাণীর দলে।

এখন খোদনের এক সখ হয়েছে, এই সব তার পোষা প্রাণীদের কথা যদি সে বুঝতে পারত, তাহলে কী মজাই না হত। কিন্তু ওদের আপন-আপন ডাক শুনে ওদের মনের কথা ত কিছু বোঝা যায় না। কি করে খোদন ওদের মনের কথা বুঝতে পারে? ঘণ্টার পর ঘণ্টা ও সজাগ হয়ে কান খাড়া করে থাকে, কিন্তু টিক্‌টিকির টিক্‌টিক্, টিয়ার আবোল তাবোল, বেড়ালের মিউ মিউ, কুকুরের ভৌ-ভৌ, আর বানরের কিচির মিচির ছাড়া ওর ভেতর কোনো মানে খুঁজে পায় না।

আহা, এমনটি হতে পারে না যে, হঠাৎ একদিন যেন ওদের সব ডাকাডাকির অর্থ বুঝতে পারে, ওদের সবাইকার মনের কথা জানতে পারে। খোদন শুধু ভাবে, কিন্তু কোনো কূলকিনারা পায়না।

একদিন গভীর রাতে খোদনের ঘুম ভেঙে গেল। আর অবাক

কাণ্ড! ওর পোষা প্রাণীরা ছড়া বলছে—শুনতে পেলো। সে ছড়ার মানেও দিব্যি বুঝতে পারল।

ওর খাঁচায় পোষা টিয়াটি মাথা দুলিয়ে বলছে—

অঙ্ক যদি না কসে ত' খাবে স্যারের গাঁট্টা—
বন্ধু সাথে ঝগড়া করে কসেই খাবে মারটা!
খোদন যদি না করে ভাই সবার সাথে ভাবটা
দুষ্টু হবার ডাকটিকিটে জমবে যে ওর পাপটা!

খোদন ভাবে ভাল রে ভাল!

যে টিয়াটাকে সে ছোলাভেজা, ছাতু, পেয়ারা খাওয়ায়, আর বেছে বেছে লাল লঙ্কা এনে দেয়—তার মুখে এই কথা! আচ্ছা দেখা যাক্, ওর পেয়ারের কুকুরটা কি বলে! সে এই দস্যি কুকুর-টাকে নিজের হাতে সাবান দিয়ে নাইয়ে দেয়, মাংস ভাত খাওয়ায় আর নিজে না খেয়ে বাটি বাটি দুধ খাওয়ায়—আরও দুর্দান্ত হবার জন্যে। খোদন দস্যিটার মুখের দিকে কৌতূহলী হয়ে তাকায়।

'দস্যি' তখন তার লটপটে কান দুটো দুলিয়ে বলছে—

না দেখে পথ পার হয় যদি খোকন—
চাপা পড়েই করতে হবে রোদন।
চক্ষু খুলে করলে চলার শোধন—
প্রাণে বেঁচেই করবে প্রাণের বোধন!

দস্যিটাও ওকে আজ উপদেশ দিচ্ছে! ওর আদরের বেড়াল 'তুলতুলে'টা কি বলছে শোনা যাক—

চোখ দুটি বন্ধ করে ল্যাজ ফুলিয়ে তুলতুলে তখন ছড়া কাটছে—

মোর দুধ খেয়ে নেয় দিনরাত 'দস্যি'—
খোদন না বলে কিছু বোকা হয়ে পস্যি!
মনে ভাবি নাকে ওর গুঁজে দেবো নস্যি—
মাথাটা কামিয়ে ফেলে ঢেলে দেবো লস্যি!

ছড়া শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে খোদন—।

ওদের জন্য তার দিন রাত ভাবনা চিন্তা, আর পেয়ারের জানোয়াররা কিনা ওর মাথায় লস্যি ঢেলে দিতে চায়! ওদের খাওয়ানো-দাওয়ানো আর ভালোবাসবার এই কি ফল! খোদন রাগের মাথায় নিজের চুলই ছিঁড়তে থাকে।



চটপটি বানর তখন নিজের মাথার উকুন নিজেই বেছে নিয়ে চটপট মুখে পুরে দিচ্ছিল।

আচ্ছা শোনা যাক্—বাঁদর আবার কি বলে—

নিজে করি সব কাজ
খোদনের জাঁক তো
দিনরাত কি বড়াই শুধু হাঁক ডাক তো
গুমোরের নেই শেষ কথা কয় লাখ তো
ফেল হলে দুয়ো দুয়ো
বাজবে না শাঁক তো।

খোদন আঁৎকে উঠে বলে, 'অ্যাঁ! আমি ফেল হবো? এইজন্যে 'চট্‌পটি'টাকে এত করে কলা খাওয়াই? এ যেন একেবারে ভস্মে ঘী ঢালা হচ্ছে। হা অদৃষ্ট!!'

এইবার খোদন ভাবে, দেয়ালের টিক্‌টিকিটা কি টিপ্পনি কাটে শোনা যাক—!

দেয়ালের টিক্‌টিকি তখন ছড়া কাটছে—

দেয়ালের টিক্‌টিকি—করি শুধু টিক্‌টিক—
খনার জিবটা খেয়ে কথা কহি ঠিক ঠিক
ছোঁড়া যদি কাঠি দিয়ে শুধু মোরে করে দিক
চোখ দুটো চেটে নেবো জেনো আমি নির্ভীক!'

পুঁচকে টিক্‌টিকির কথা শুনে খোদন রেগে একেবারে আগুনের মতো জ্বলে উঠল। বল্লে,—না—না, আমি ওদের কোনো কথা শুনতে চাইনে, বুঝতে চাইনে,—সকলের মনের কথা জানার বিপদ আছে।

আপন মনে থাকতে যে চাই
হল্লা-হাসির সাথে
পড়াশোনায় লাগবো এবার
তাইত পরাণ মাতে।

রাজেনের রাজহাঁস

রাজহাঁসটার মনে এতটুকু সুখ নেই !

রাজেনের জন্মদিনে তার কাকা পছন্দ করে এই রাজহাঁসটি ওকে উপহার দিয়েছিল।

কী সুন্দর ধপ্‌ধপে সাদা তার রং, দেখলেই গায়ে হাত বোলাতে ইচ্ছে করে।

রাজহাঁসটিকে খুব ভালোও বাসে রাজেন। ওদের বাড়ীর সামনে টল্‌টলে কাক-চক্ষু জলের একটি বড় পুকুর। রোজ সকালে রাজেনের প্রথম কাজ হচ্ছে, হাঁসটিকে পুকুরের জলে ছেড়ে দেয়া।

রাজহাঁসটি যখন সেই পুকুরের জলে সাঁতার কাটে, ছোট ছেলে-মেয়েদের তখন ভীড় লেগে যায় ঘাটলায় আর তার আশেপাশে।

সবাই তারা হাততালি দিয়ে রাজহাঁসটিকে উৎসাহ দেয়। কেউ কেউ বা চীৎকার করে বলে—"বাঃ বাঃ! ঠিক যেন একটি সাদা জাহাজ ভেসে যাচ্ছে।"

আর একজন চোখ পিট পিট করে বলে—"দেখ্ দেখ্, জলে ওর কেমন সুন্দর ছায়া পড়েছে!"

ছেলে-মেয়েদের যেন খুশীর সীমা নেই। কিন্তু হাঁসটির মনে এতটুকু সুখ নেই। কারণ রাজেনের আদরের অত্যাচারে সে সব সময় কাবু হয়ে থাকে।

হাঁসটাকে সাবান মাখিয়ে রাজেন যখন স্নান করাতে শুরু করে, হাঁসটির তখন একেবারে প্রাণান্ত।

স্নানের পর আবার খাওয়ানোর ঘটা কত। এমনিতেই হাঁসটা পুকুর থেকে গুগ্‌লি, শ্যাওলা, ব্যাঙাচি, ছোট ছোট মাছ তার খুশি মতো খেয়ে আসে। কিন্তু তাতেই কি বেচারীর নিস্তার আছে ?

বাড়ীতে এলে রাজেন আবার আদর করে তাকে খাওয়াবে। কখনো দুধ, কখনও ফ্যানা-ভাত, কখনো পাকা কলা, যখন যেটা হাতের কাছে পায়।

অতি আদরে হাঁসটা হাঁস্-ফাঁস্ করতে থাকে কিন্তু রাজেনের হাত থেকে তার ছাড়ান নেই। অথচ আদরের মাত্রা বেশী হয়ে গেলে সেটা যে পীড়ন হয়, সে কথা রাজেনকে কে বুঝিয়ে দেবে?

শুধু কি তাই?

খেলার মাঠেও রাজহাঁসটির গলায় দড়ি বেঁধে রাজেন সঙ্গে করে নিয়ে যায়। হা-ডুডু আর গোল্লাছুট খেলার সময় তাকে নিয়ে ছুটো-ছুটি করে। তাই দেখে ছেলের দল আনন্দে হৈ-হুল্লোড় করে ওঠে।

রাজেন একদিন ক্লাশেও নিয়ে গিয়েছিল তার এই হাঁসটাকে। দেখে তো গোটা ক্লাশের ছেলেরা সেদিন এমন হৈ-হল্লা শুরু করে দিল যে, হেড্ স্যার এসে রাজেনকে এক টাকা জরিমানা করে দিলেন।

সেই থেকে রাজেন আর ইস্কুলে নিয়ে যায় না তার হাঁসটাকে।

এদিকে ওই হাঁসটার জন্যে চারদিকে ছোঁক্ ছোঁক্ করে ঘুরে বেড়ায়—এমন লোকেরও অভাব নেই। পাশের বাড়ীর নন্দী মশায়ের দৃষ্টি পড়েছে ওর ওপরে।

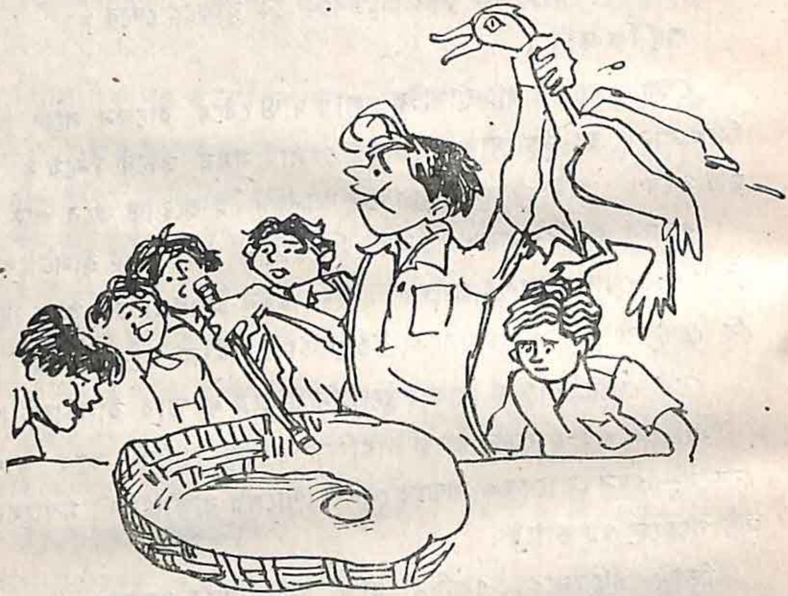
তিনি রাজেনকে একদিন চুপি চুপি ডেকে বললেন—"শোন রাজেন, রাজ হাঁসের রোষ্ট নাকি ভারী উপাদেয়। আয় না, ওটাকে দিব্যি করে রোষ্ট বানিয়ে ফেলি! ভয় নেই রে, তোকেও নেমন্তন্ন করবো। আর তাছাড়া তোকে একটা ভালো প্রাইজ দেবো, বুঝলি? নগদ টাকা যদি চাস, তাও নিতে পারিস।"

রাজেন এমনভাবে নন্দী মশায়ের দিকে তাকিয়েছিল যে, আগে-কার দিন হলে নন্দী মশাই একেবারে ভস্ম হয়ে যেতেন। তারপর থেকেই নন্দী মশায়ের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ। এমন কি তাঁর বাড়ীর দিকটায় শক্ত করে একটা বেড়াও দিয়ে দিয়েছে রাজেন।

কিছুদিন আগের কথা। ইস্কুলের ছেলেরা পুরস্কার বিতরণ

উৎসব উপলক্ষে একটা অনুষ্ঠান করলো। খেলাধূলার পর ছেলের দল "যেমন খুশী সেজে যাবে।" যার সাজা সব চাইতে ভালো হবে, তাকে পুরস্কার দেয়া হবে।

ছেলেদের মধ্যে কেউ সেজেছে ভিখারী, কেউ সাহেব, কেউ কুষ্ঠ রোগী, কেউ বাস্তুহারা, আবার কেউ ডাক্তার।



রাজেন কিন্তু সেজেছে যাদুকর। রাজহাঁসটাকে ঝুড়ির ভেতর থেকে তুললেই দেখা যাচ্ছে—সেই ঝুড়ির ভেতর হাঁস ডিম পেড়ে রেখেছে। যতবার হাঁসটাকে তোলা হচ্ছে, ততবার ডিম লাভ। এই হাত-সাফায়ের খেলায় রাজেনকে সবাই তারিফ করতে লাগলো।

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, হেড স্যার রাজেনকেই চমৎকার একটি সুটকেশ উপহার দিয়েছেন।

সুটকেশ হাতে নিয়ে রাজেন হাসতে হাসতে বাড়ীতে এসে ঢুকলো।

কিন্তু রাজহাঁসের কি লাভ হ'ল ? দীর্ঘ সময় ঝুড়ির মধ্যে আটকে

থেকে বেচারার প্রাণ যায় আর কি! তাছাড়া অনেকক্ষণ ধরে রদ্দুরে থেকে হাঁসটা খাবি খাচ্ছে, আর ক্ষিধেয় ধুক্‌ছে—সেদিকে কারো নজর নেই!

যাই হোক, অনেকক্ষণ বাদে রাজহাঁসটা শ্রীমান রাজেনের হাত থেকে ছাড়ান পেলে, আর বাড়ী গিয়ে কিছুটা খাবার পেয়ে তার ধড়ে প্রাণ ফিরে এলো।

এই হাঁসকে নিয়ে রাজেনের নতুন নতুন উদ্ভট পরিকল্পনার অন্ত নেই।

রাজেনের উর্বর মস্তিষ্কে নানা জাতীয় প্ল্যান ঘুরে বেড়ায়।

একবার সে এক প্রতিযোগিতার আয়োজন করলে। তাদের গ্রামে যত হাঁস আছে—তাদের মালিকদের খবর দেয়া হ'ল, হাঁসেদের সন্তরণ প্রতিযোগিতা হবে।

হাটে-বাজারে ঢোল পিটিয়ে জানিয়ে দেয়া হ'ল—কোন তারিখে এই সন্তরণ প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হবে।

ছেলে মহলে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। এবার হবে হাঁসেদের প্রতিযোগিতা। রাজেন হচ্ছে উদ্যোক্তা। ওদের পুকুরেই প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হবে। তার আর নিঃশ্বাস ফেলবার সময় রইল না।

একদিন গাঁয়ের ছেলেদের সবাইকে ডেকে একটা আলোচনা সভার আয়োজন করলে। তাতে এক একটা ছেলের ওপর এক একটা কাজের ভার চাপিয়ে দিলে। কেউ হাঁসেদের মালিকদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে তাদের নাম ও বয়েস সংগ্রহ করবে। আর একদল ছেলে টিকিট নম্বর লিখবে। সেই টিকিটগুলি যথাসময়ে প্রতিযোগিতা শুরু হবার ঠিক আগে হাঁসেদের গলায় ঝুলিয়ে দেবে। আবার কয়েকজন ছেলের ওপর দায়িত্ব দেয়া হ'ল—নানা যায়গায় বাঁশের খুঁটি পুঁতে তাদের লিখতে হবে—প্রতিযোগিতা শুরু হবার স্থান, ছোটদের সমবেত হবার স্থান, মহিলাদের স্থান ইত্যাদি।

এছাড়া দু'টি ডিঙি নৌকো জোগাড় করা হ'ল। তার একটিতে

লেখা হ'ল—"ডাক্তারের নৌকো।" অপরটিতে লেখা হ'ল—"স্বেচ্ছা সেবক নৌকো।"

তারপর নির্ধারিত দিনে হাঁসেদের সন্তরণ প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল।

আশে-পাশের সাতখানা গাঁয়ের ছেলে-মেয়ে-বুড়োরা এসে রাজেনদের পুকুরের চারপাশে ভীড় করলে। কিন্তু যার জন্য এত কাণ্ড—সেই রাজেনের রাজহাঁস শেষরক্ষা করতে পারলে না।

এই প্রতিযোগিতায় রাজহাঁসটা প্রথম হতে তো পারলই না, একেবারে অনেক পেছনে পড়ে রইল।

পাতিহাঁসগুলো জলের ওপর দিয়ে তর্ তর্ করে এগিয়ে গিয়ে রাজহাঁসটাকে অনেক পেছনে ফেলে দিলে।

রাগে, দুঃখে, লজ্জায় রাজেন নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে শুরু করে দিলে!

ফলে অর্ধপথেই ভণ্ডুল হয়ে গেল এই প্রতিযোগিতা। সবাই রাজেনকে গালাগাল দিতে দিতে ঘরে ফিরে গেল। পাতিহাঁসের মালিকেরা মহা খাপ্পা হয়ে উঠলো। তাদের হাঁসেরা সাঁতারে অনেক আগে গিয়েও কোনো পুরস্কার পেলে না। তাই তাদের যত রাগ গিয়ে পড়লো রাজেনের ওপরে।

বিপদের ওপরে দেখা দিলে রাজেনের বিপদ। বাৎসরিক পরীক্ষায় এবার ফেল করেছে রাজেন!

আর যাবে কোথায়!

বাড়ীর লোকেরা রাজেনের ওপর মহা খাপ্পা হয়ে বললো—"সারাদিন যদি হাঁস নিয়ে কেবল হৈ-হৈ করবি, তো পড়বি কখন?"

রাজেনের ওপর আদেশ হ'ল—সবকিছু হুজুগ থেকে দূরে সরে এসে, রাতদিন পড়াশোনায় মন দাও। নইলে কপালে অনেক দুঃখ আছে তোমার।

সাঁতরাগাছির ওলের মতো মুখ করে রাজেন গিয়ে পড়ার ঘরে ঢুকল।

এক বছর পরের কথা ঃ

বাৎসরিক পরীক্ষা হয়ে গেছে। ফল বেরুলে দেখা গেল রাজেন এবার পাশ করেছে। শুধু পাশই নয়, একেবারে প্রথম স্থান অধিকার করেছে রাজেন।

বাঘ শিকারের কাহিনী

বাঘ থাকে গভীর অরণ্যে।

আর শিকারী থাকে মানুষে ভর্তি শহরে।

তবু মাঝে মাঝে এদের দু'জনের সঙ্গে দেখা হয়।

ওই যে রবি কবি এক সময় লিখে গেছেন—

"খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে—
বনের পাখি ছিল বনে—
একদা কি করিয়া মিলন হল দোঁহে—
কি ছিল বিধাতার মনে।"

শিকারীর সঙ্গে বনের বাঘের হঠাৎ দেখা না হলে—এমনি আচম্‌কা বাঘ শিকারের কাহিনী লেখা হবে কি করে?

এমনি এক আচম্‌কা ঘটা বাঘ-শিকারের কাহিনী তোমাদের শুনিয়ে দিচ্ছি।

শিকারী থাকে জন-অরণ্যে।

আর বাঘ বাস করে ঘন-অরণ্যে।

দু'জনের দেখা নেই, সাক্ষাৎ নেই, পরিচয় নেই। তবু দশজনের পাল্লায় পড়ে এক শুভ-মুহূর্তে দেখা হয়ে যায় পরস্পরের।

আর শুভ মুহূর্তেই বা বলি কি করে?

দুঃসময়েই দেখা হয় নিশ্চয়।

তার ফলে একজনের পরাজয় আর অপর জনের জয়।

তারপর—অনেক হৈ-হল্লা—লোকজন—মশাল—বাঁশের চতুর্দোলায় বয়ে আনা—জংলী মানুষগুলির দারুণ উল্লাস।

কিন্তু যখন শিকারের কোনো ডাক থাকেনা—

তখন শিকারী লক্ষ মানুষের ঘন বসতিতে বাস করে—

শহরে তার দিন কাটে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে গল্প গুজব করে, ট্রামে-

বাসে-ট্যাক্সিতে এখানে-ওখানে-সেখানে বেড়িয়ে—আর না হয় সিনেমা দেখে,—কিম্বা শুয়ে শুয়ে বই পড়ে।

তখন দেখে মনে হয়—এ মানুষটা ত' দারুণ কুঁড়ে।

এ কি জীবনে কখনো বন-জঙ্গল দেখেছে ?

সাম্‌না-সামনি বাঘ দেখেছে কখনো ?

এর চেহারা দেখে ত কিছুই বোঝবার যো নেই !

এই মানুষ আবার বনে গিয়ে বাঘ মারবে ?

সবাই বলাবলি করে, নিজেদের মধ্যে ফিস্‌ফাস করে—, শিকারী বেড়ালের গোঁফ্ দেখ্‌লেই চেনা যায়। বাঘ মারা এর কম্ম নয়। কিন্তু কার মধ্যে কি হিম্মৎ লুকিয়ে আছে—বাইরে থেকে মানুষ তার কতটুকু বুঝতে পারে ?

যে শিকারীর গল্প আজ শোনাতে যাচ্ছি,—তার নাম হচ্ছে অরবিন্দ গুহ। এই শিকারীর বয়েস বেশী নয়। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছরে হালে পা দিয়েছে। কিন্তু যে কাজটা ধরবে—তাকে হাশিল করা চাই। এমনি শিকারীর মনে জোর।

কোনো দুর্গম অরণ্যে যেতেই অরবিন্দ পেছ-পা নয়। কোনো রকম কষ্ট স্বীকার করতেই সে পশ্চাৎপদ নয়। একবার যদি গোঁ হল—তবে সে কাজ শিকারী সমাধা করবেই।

এই অরবিন্দ এতদিন গল্প-গুজব করে, বন্ধুদের সঙ্গে বন-ভোজনের আনন্দে যোগ দিয়ে, দেশী-বিদেশী নানারকম ছবি দেখে আর বহু রকম বই পড়ে সময় কাটিয়ে দিচ্ছিল।

অরবিন্দ নিজেও শিকার কাহিনী লিখে থাকে। পাঠক-পাঠিকারা সেই শিকারের গল্প রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে পাঠ করে।

সুতরাং বেশ বোঝা যায় যে অরবিন্দের শিকার কাহিনীর বাজারে বেশ চাহিদা আছে।

বন্ধু-বান্ধব মহলে শিকারী হিসেবে তার সুনামও আছে। অরবিন্দ যখন ঘরভর্তি লোকের সামনে তার বিচিত্র সব শিকারের গল্প শোনাতে

আরম্ভ করে তখন সকলে নিঃশ্বাস বন্ধ করে সেই কাহিনী শোনে। হাতের গরম চায়ের কাপ ঠাণ্ডা হয়ে যায়, সে দিকে কারো এতটুকু নজর থাকে না।

এই যে নামকরা শিকারী অরবিন্দ গুহ—দীর্ঘদিন সে কোন শিকার অভিযানে বেরুতে পারে নি।

বেরুতে পারেনি নানা কারণে।

প্রথমত বাইরে থেকে শিকারের জন্য কোনো জরুরী ডাক আসেনি। আর দ্বিতীয় কথা হল— তার একটি চাঞ্চল্যকর শিকার কাহিনী প্রেসে ছাপা হতে গিয়েছিল। পুস্তকাকারে সেটা প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত নামকরা শিকারী অরবিন্দ গুহের কিছুতেই কলকাতা থেকে বাইরে দূরে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না।

এই সবাইকার চেনা নামকরা শিকারী অরবিন্দ গুহ একদিন সকাল বেলা তার ড্রয়িং রুমে বসে আমেজ করে চা পান করছিল, আর খবরের কাগজ পড়ছিল, এমন সময় একটা জরুরী টেলিগ্রাম তার হাতে এসে পৌঁছলো।

হ্যাঁ, সত্যি এবার বাইরে থেকে ডাক এসেছে।

সেই অনেক দূরে হিমালয়ের পাদদেশে এক বিরাট অরণ্য। আর তারই লাগোয়া গরীব দেশোয়ালী মানুষদের একটা মাঝারি ধরনের বস্তি!

সেই অঞ্চলেই বাঘের উপদ্রব সুরু হয়েছে।

ওই অঞ্চলের নামকরা পুলিশ অফিসার খান সায়েব।

আমন্ত্রণ এসেছে—সেই খান সায়েবের কাছ থেকেই।

এই খান সায়েব শিকারী অরবিন্দ গুহের বিশেষ বন্ধু। খান সাহেব আর অরবিন্দ গুহ এক সময়ে ছাত্র-জীবনে একই কলেজে পড়াশোনা করেছে।

তাদের পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতা হয় সেই কলেজ জীবনে। খান সায়েব শিকারী অরবিন্দ গুহের কেরামতির কথা বিলক্ষণ অবগত

ছিল। তাছাড়া অরবিন্দ গুহ যে সব শিকার-কাহিনী রচনা করতো খান সায়েব ছিল তার একজন অনুরক্ত পাঠক।

দূরে দূরে নিজেদের কর্মস্থল থাকলেও খান সায়েব সব সময় অরবিন্দ গুহের সব খবরই রাখত।

অরবিন্দ গুহও অনেক সময় খান সায়েবের কর্মস্থলে গিয়ে অবসর যাপন করে আসত।

এছাড়া খান সায়েবের অনুরোধে অরবিন্দ গুহ বেশ কয়েকবার গিয়ে নানারকম জানোয়ার শিকার করে তার অঞ্চলকে বিপদ-মুক্ত করে এসেছে।

সেই প্রাণের বন্ধু খান সায়েবের কাছ থেকে আকুল আহ্বান এসেছে যে, ওই অঞ্চলে দারুণ বাঘের উপদ্রব চলছে, কাজেই



অরবিন্দ গুহকে অবিলম্বে ওখানে রওনা হতে বিশেষ করে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

অরবিন্দ গুহের ঠিক এই মুহূর্তে বাইরে বেরুবার কোনো অসুবিধে নেই। গতকালই প্রকাশকের দোকানে গিয়ে দেখা গেছে যে, তার নতুন শিকার কাহিনীটা প্রকাশিত হয়েছে।

অরবিন্দ গুহের নতুন শিকার কাহিনী প্রকাশিত হলেই পাঠক-পাঠিকা মহলে তার একটা চাহিদা হয়। কাজেই লেখক এখন কিছু দিনের মতো নিশ্চিন্ত। তার বই বাজারে তাড়াতাড়ি বিক্রি হয়। এ খবর অরবিন্দ গুহের জানা আছে। তাই এখন সে নিশ্চিন্ত মনে লেখকের ভূমিকা পরিত্যাগ করে শিকারীর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। ফলে পরবর্তী বইয়ের কিছু মাল-মশলা নিশ্চয়ই সংগ্রহ করা সম্ভবপর হবে।

খান সায়েব ওর ওখানে যাবার সব রকম ব্যবস্থা যে করে রাখবে এ ত' জানা কথাই।

অরবিন্দ গুহের মতো খ্যাতিমান লোকের রেলের টিকিট জোগাড় করতে বিশেষ অসুবিধে হয় না। রেলওয়ে বিভাগেও তার অনেক অনুরক্ত ভক্ত আছে। সুতরাং সে একটি ফোন করলেই সংরক্ষিত আসন পেয়ে যাবে—সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ঘরে বসে ফোন করেই তার সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। আর নির্ধারিত দিনে স্যুটকেশ আর ছোট একটি হোল্ডঅল্ নিয়ে বিখ্যাত শিকারী অরবিন্দ গুহ দুর্গানাম স্মরণ করে নতুন অভিযানে বেরিয়ে পড়ল।

উত্তর ভারতে—হিমালয়ের পাদদেশে হলুদরঙা একটি ছোট রেল স্টেশন।

এইখানেই শিকারী অরবিন্দ গুহকে নামতে হবে। ট্রেন বেশী লেট করেনি। যথাসময়ে অরবিন্দ গুহ সেখানে পৌঁছে দেখে—প্ল্যাটফর্মে স্বয়ং খান সায়েব পাইচারি করছে।

তাঁকে ট্রেনের জানালার ভেতর দিয়ে দেখেই খান সায়েব ডান হাত তুলে সাদর অভ্যর্থনা জানালো।

অরবিন্দ গুহ আশাই করেছিল যে, স্বয়ং খান সায়েব স্টেশনে উপস্থিত থেকে তাকে সাদর-সম্ভাষণ জানাবে।

নিজের আকাজ্ক্ষা পূরণ হতে শিকারী অরবিন্দ গুহ খুব খুশী হয়ে নিজেও ক্রমাগত হাত নাড়তে লাগল।

এর মধ্যে গাড়ী প্ল্যাটফর্মে এসে একেবারে থেমে গেছে। খান সায়েবের আর্দালী কামরায় ঢুকে শিকারীর স্যুটকেশ আর হোল্ডঅল্ বের করে প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দাঁড়ালো।

ইতিমধ্যে দুই বন্ধু প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে উত্তাপে নিজেদের অভিনন্দিত করল।

স্টেশনের বাইরেই খান সায়েবের জিপ অপেক্ষা করছিল। দুই বন্ধু হাত ধরাধরি করে সেই গাড়ীতে গিয়ে উঠল।

ড্রাইভার খান সায়েবের নীরব সম্মতি পেয়ে জিপ ছেড়ে দিল।

আঁকা-বাঁকা বনপথে সরকারী জিপ এগিয়ে চললো। পথের দু'ধারে বড় বড় শালের বন।

এই বনে যে কেউ কখনো ঢোকে—সে কথা ঠিক বলা শক্ত।

গাছগুলির মাথায় নানা জাতের অচেনা পাখী উড়ে বেড়াচ্ছিল, মিষ্টি সুরে ডাকছিল আর রোদের কিরণ মাথায় মাখছিল।

স্টেশনের হলুদরঙা নামটা যে সার্থক—সে কথা অরবিন্দ গুহ মনে মনে বেশ বুঝতে পারছিল।

খুব বেশীক্ষণ তাদের জিপে করে অগ্রসর হতে হয়নি। মাইল দুয়েক দূরে দেখা গেল—অনেকগুলি সাদা তাঁবু খাটানো হয়েছে। খান সায়েব আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বন্ধুকে ভরসা দিয়ে বল্লে, ওই আমাদের ডেরা। স্টেশন থেকে কিন্তু খুব বেশী দূরে নয়।

শিকারী মৃদু হেসে উত্তর দিল, দূরে হলেও আমার আপত্তির কোনো কারণ ছিল না—জিপ যখন আমাদের পৌঁছে দেবার জন্যে প্রস্তুত আছে।

খানিক বাদেই ওরা সুসজ্জিত একটি তাঁবুর সাম্‌নে গিয়ে হাজির হল।

ভেতরে ঢুকে দেখা গেল—তাঁবুটি মোটামুটি বড়। তার ভেতর দুটি ক্যাম্প খাট আর দুটি টেবিল। কয়েকটি চেয়ারও রয়েছে সাজানো। খান সায়েব শিবিরের ভেতরটা দেখিয়ে সোল্লাসে কইলে, কী? পছন্দ হয়? এই হবে আমাদের আস্তানা। দুইজনে এই এক তাঁবুতেই থাকবো। তা হলে রাত্তিরে গল্প করবার সুবিধে হবে।

অরবিন্দ গুহ রসিকতা করে উত্তর দিলে, কিন্তু রাত্তিরে কি এই সুন্দর শয্যায় ঘুমোবার সুযোগ পাবো? হয়ত গাছের ডালের ওপরই রাত কাটাতে হবে।

খান সায়েব বললে, আরে, রোজই কি আর গাছের ডালের ওপর রাত কাটাতে হবে? তারই ফাঁকে ফাঁকে পোলাও—মাংস চেখে দেখতে হবে। খাসা চা আর কফি নিয়ে এসেছি—আরাম করে চা পানের মতো আমেজ আর কোথায় আছে? এ ছাড়া ক্যাম্প খাটে ডানলোপিলোর গদী পেতে দেবো। এক ঘুমে—রাত কেটে যাবে—! হুঁ! দেখে নিও।

ইতিমধ্যে কফি আর গরম হালুয়া এসে পড়েছে। অরবিন্দ গুহ সেই দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

খান সায়েব মিটিমিটি হেসে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বললে, আমার বাবুর্চি আমজাদ—যা খাসা বিরিয়ানি পোলাও আর ফাউলকারী পাকায়—হুঁ—তার আর তুলনা নেই।

শিকারী ভালো করে হালুয়া এক চামচ মুখে পোরেনি এমন সময় এক স্থানীয় দেশোয়ালী যুবক প্রবল আর্তনাদ করে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে মেঝেতে বসে পড়ে নিজের মাথা ঠুকতে লাগলো।

—আ-হা-হা! করিস কি—করিস কি? বলে খান সায়েব চীৎকার সুরু করে দিলে।

—কী হয়েছে তোর ? এমন করে কাঁদছিস কেন ? দেশোয়ালী যুবকটির নাম—মুংরা।

তার দুই চোখ জলে ভর্তি।

গলার ভেতর দিয়ে কেবলি একটা আর্তনাদের মত বেরুচ্ছে—

অনেক ধমক-ধামক দেবার পর মুংরা হতাশ ভাবে ওদের মুখের দিকে তাকালো। তারপর বললে আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে বাবু—মুংলিকে বাঘে কামড়ে নিয়ে পালিয়ে গেছে—

শিকারী অরবিন্দ গুহ জিজ্ঞেস করল, মুংলি কে ?

দেশোয়ালী যুবকটি আবার মাথা চাপড়ে জবাব দিল, মুংলি ? মুংলি আমার বহু—। ডাকাত বাঘটা ওর ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে ওকে কামড়ে নিয়ে পালিয়ে গেছে।

শিকারী অরবিন্দ গুহ বল্‌লে অমন করে চীৎকার করিস নি, সব কথা আমায় খুলে বল—

শিকারীর হুমকিতে মুংরা একটু চুপ করল। তারপর বললে, বাবু, আমি সব কথা তোমাকে খুলে বলছি—

ওই যে বনের ধারে দেশোয়ালী ভাইদের বস্তি—ওর একটা ঝুপড়িতে আমরা থাকি। আমার মা, আমার বহু মুংলি আর আমার তিন বছরের ছেলে বাবুয়া এই ক'জনে এক সাথ্‌—ঝুপড়ির ভেতর থাকি।

রোজ আমার বহু মুংলি দুপুর থাক্‌তে থাক্‌তে পাড়ার আর সব বহুদের সাথে গিয়ে পুকুর থেকে পানি নিয়ে আসে। আজ ঘরের কাজে আর বেরুতে পারে নি। বিকেলে দেখে মাটির কলসী ঠং ঠং করছে। ঘরে এক ফোঁটা পানি নেই।

তাই ছেলেটাকে ঝুপড়িতে বসিয়ে রেখে, মাথায় মাটির হাঁড়ি তুলে নিয়ে একা একা গাংগে পানি ভরতে রওনা দিয়েছে। চারদিকে শুন্‌ শান্‌ একটা দেশোয়ালী মানুষ নেই।

মুংলীর হয়ত ডর লাগলো তাই তুরন্দ ছুটল পানির দিকে।

ওদিকে ডাকাত বাঘটা পা টিপে-টিপে ছিপায়কে-ছিপায়কে মুংলির পেছু নিয়েছে, মুংলি কুছু জানতে পারেনি।

তারপর সেই দানব বাঘটা ওই মুংলির পিঠের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। যেমন মানুষ খেলনা নিয়ে পালায়—ঠিক তেমনি করে আমার বহুকে মুখে করে পালিয়ে গেল—

শিকারী জিজ্ঞেস করলে, ওরে মুংরা, তুই আপন আঁখসে দেখলি ?

মুংরা তার কপালে চাপড় মেরে বললে, হ বাবু, আমি ত' খেত সে ঘরপানে ফিরছিলাম। দেখিনা—ওই ডাকাত বাঘটা আমার বহু মুংলিকে পিঠে কামড় দিয়ে যেন ছাগল ছানার মতো নিয়ে চলেছে। আমি লাঠি নিয়ে পিছে পিছে ছুটলাম……

কিন্তু ডাকাত বাঘটার সঙ্গে দৌড়ে আমি পারবো কেন! আঁখের পলক ফেলতে-না-ফেলতে বাঘটা মুংলিকে নিয়ে কোন বন-বাদাড়ে পালিয়ে গেল।

তারপর মুংরা তার বুকের ভেতরে লুকানো একটা ছাপা শাড়ীর টুক্‌রো বের করে একেবারে যেন বেদনায় ভেঙে পড়ল।

হাউ হাউ করে চীৎকার করে বল্‌তে লাগলো, বাবু-বাবু, এই দেখ, আমার বহু মুংলির শাড়ীর ছেঁড়া টুকরা। আমি পিছু-পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে ঝোপের ধারে কুড়িয়ে পেলাম।

মুংলিকে যে কোথায় নিয়ে গেল, আমি হদিশ পেলাম না বাবু, তুমি বাবু, বন্দুক নিয়ে বাঘটাকে মেরে আমার মুংলিকে নিয়ে এসো—। আমি ওর কুছু পাত্তা পেলাম না বাবু।

মুংরা আবার তার কপাল চাপ্‌ড়ে পাগলের মতো আর্তনাদ করতে লাগ্‌লো।

খান সায়েব তখন নানা ভাবে ওকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। শিকারী অরবিন্দ গুহ বললে, আমি বাঘটাকে খতম করতে—তোর সঙ্গে নিশ্চয়ই বেরুরো। কিন্তু কোথায় তোর বহুকে বাঘটা ধরেছিল, আর কোন পথে পালিয়ে গেল—আমায় দেখিয়ে দিবি চল।

খান সায়েবের ইঙ্গিত পেয়ে ওরা আবার জিপে চড়ে বনের পথের দিকে রওনা হল।

আকাশে তখন সূয্যিমামা দুপুর বেলার আগুন ছড়াচ্ছে। কিছুদূর যাবার পর বনের মধ্যে একটা সরোবর পাওয়া গেল। দেশোয়ালী বস্তির বৌরা এই সরোবর থেকে রোজ মাটির কলসীতে পানীয় জল নিয়ে যায়।

সেদিন মুংলি একা পড়ে গিয়েছিল বলেই তাকে অকালে প্রাণ হারাতে হল।

এইবার জিপ থেকে নেমে শিকারী ভালো করে সেই বনপথ খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

আরো খানিকটা এগিয়ে যাবার পর পথের মাঝখানে কয়েকটি ভাঙা কাচের চুড়ি পাওয়া গেল। মুংরা সেইগুলি দেখে তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

—এইত' আমার মুংলির হাতের চুড়ি। আমি কয়েকদিন আগে মেলা থেকে কিনে দিয়েছিলাম!

মুংরা দারুণ আগ্রহে সেই ভাঙা কাচের চুড়িগুলো পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে নিজের গামছার মধ্যে বেঁধে রাখলে।

বেশ কিছুটা এগুবার পর সেই সরোবরের ধারে মুংলির অর্ধেক খাওয়া দেহটি পাওয়া গেল।

শিকারী বল্‌লে, বাঘটা অর্ধেক দেহ খেয়ে এই সরোবরে জল পান করেছে। হয়ত অন্য কোনো লোক বা জন্তুর সাড়া পেয়ে বাঘটা সাময়িক ভাবে পালিয়ে গেছে। মাংসের লোভে বাঘটা আবার আসবে।

চারদিকে তাকিয়ে শিকারী অরবিন্দ গুহ বল্‌লে এই যে কাছেই একটা অশ্বত্থ গাছ রয়েছে। এর ওপরই মাচা বাঁধতে হবে। আমি আজ রাত্রে বন্দুক নিয়ে এই মাচার ওপরই থাকবো।

খান সায়েব শিকারীকে আশ্বাস দিয়ে বললে, তোমার কোনো

আফ্‌শোস করার থাক্‌বেনা। আমি লোক ডেকে মাচা তৈরীর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

যতক্ষণ শিকারী আর খান সায়েব নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল,—মুংরা পথের পাশে লুটিয়ে পড়ে মুংলির অর্ধেক খাওয়া দেহটিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে ক্রমাগত আদর করছিল, আর পাগলের মতো আর্তনাদ করছিল।

শিকারী অনেক চেষ্টা করেও তাকে থামাতে পারছিল না। অবশেষে জিপের ড্রাইভারের সাহায্যে মুংরাকে পথের ধুলো থেকে তুলে ওদের ঝুপড়ির দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

শিকারী ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্‌লে, তোকে আমি কথা দিচ্ছি মুংরা, আজ রাত্রেই বাঘটাকে বন্দুকের গুলীতে হত্যা করে তোর মুংলির নিধনের প্রতিশোধ নেবো।

মুংরার তখন কোন সান্ত্বনার বাণী শোনাবার মতো মনের অবস্থা নয়। সে আর্তনাদ করে বার বার মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিল। অবশেষে কোনো ক্রমে তাকে আবার ধরে তুলে দেশোয়ালী ভাইদের বস্তির দিকে পাঠিয়ে দেয়া হল।

তখন দুই বন্ধুর মধ্যে গোপন আলোচনা সুরু হল। অশ্বত্থ গাছের ওপরে কি ভাবে মাচা তৈরী করতে হবে—সেই বিষয়ে শলা-পরামর্শ চল্‌লো।

তারপর দুই বন্ধু আবার তাঁবুতে ফিরে এলো।

সেদিন মধ্যাহ্নে ভোজনে বেশ বিলম্ব হয়ে গেল।

তবে বাবুর্চি আমজাদের ব্যবস্থাপনার কিছু মাত্র ত্রুটি ছিল না। সরুচালের বিরিয়ানী পোলাও আর বন্য কুক্কুটের কোর্মা অতি উপাদেয় হয়েছিল। তার পরেও ছিল—পায়েস।

শিকারী খাওয়া-দাওয়ার পর বল্‌লে, এইবার আমি খানিকটা ঘুমিয়ে নেবো। বলা যায় না, হয়ত সারা রাতই জেগে কাটাতে হবে।

খান সায়েব উত্তরে বললে, সে কথা সত্যি। বিছানা পাতা আছে। গদীতে শুয়ে তুমি ঘুমিয়ে পড়। কেউ তোমায় বিরক্ত করবে না। ইতিমধ্যে আমি অফিসের ফাইলগুলো শেষ করে ফেলি।

সূর্য ডোবার আগেই শিকারীর ঘুম ভেঙে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমজাদ ধূমায়িত চা আর অমলেট এনে হাজির করল। সে সব আয়েস করে খেয়ে নিয়ে শিকারী বেশ চাঙা হয়ে উঠল।

এই সময় খান সায়েব অন্য একটি তাঁবু থেকে ফিরে এসে শুভ-সংবাদ পরিবেশন করলে, দোস্ত, অশ্বত্থ গাছের ওপর বেশ বড়-সড় একটি মাচা তৈরী করা হয়েছে। তার-ওপর বিছানা পেতে দেয়া হয়েছে। দরকার মতো তুমি সেই বিছানায় শুয়ে থাকতেও পারবে।

শিকারী রসিকতা করে উত্তর দিলে, বিছানা পেতে ঘুমুতে গেলে আর বাঘ শিকার করতে হবে না। বরং গভীর নিশীথে একেবারে সরাসরি বাঘের পেটে যাওয়ারই সম্ভাবনা।

শিকারীর কথা শুনে খান সায়েবের মুখে হাসি ফুটে উঠল। বললে, চল হে দোস্ত, একবার রজনীর রণস্থলটা পর্যবেক্ষণ করে আসবে।

তখন দুই বন্ধু আবার জিপে করে রওনা হল।

অশ্বত্থ গাছের উপরের দিকের দুটি শক্ত ডালের ওপর মজবুত মাচাটি দেখে শিকারী ভারি খুশী হল।

আপন মনে শিষ দিয়ে চারদিকটা বেশ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। বাঘটা রাত্রে কোন দিক দিয়ে আসবে—সেটা সরেজমিনে তদন্ত করে দেখল।

মুংলির আধা-খাওয়া মৃতদেহটি এখনো সেইভাবে পড়ে আছে। আশে-পাশে কতকগুলি কাক কা-কা শব্দ করে ডাকছিল।

কিন্তু খান সায়েবের লোক গুল্‌তি মেরে তাদের তাড়িয়ে দিয়েছে।

চারদিকটা বেশ ভালো করে দেখে নিয়ে শিকারী বেশ নিশ্চিন্ত হল বলে মনে হল।

সাবধানের মার নেই।

গাছের নীচে একটি নধর ছাগলও বেঁধে রাখা হল। যাতে মুংলির দেহটা কামড়ে নিয়েই বাঘটা পালিয়ে না যায়—সেই জন্যে নতুন করে টোপ ফেলা হল।

এখন দেখা যাক—গভীর রাত্তিরে এই বনভূমিতে কি নাটক অভিনীত হয়।

দুই বন্ধু তখন নিশ্চিন্ত মনে জিপে করে আবার তাঁবুতে ফিরে এলো।

তাঁবুতে ফিরে এসে শিকারী কি কি বস্তু রাতের জন্য সঙ্গে নিতে হবে—সেগুলো গুছিয়ে একটি হালকা ব্যাগে ভর্তি করে ফেলল।

খান সায়েব রসিকতা করে টিপ্পনি কাটলে, বাঘের ব্যাগও নেই, বিছানাও নেই। কিন্তু তাকে খতম করবার জন্য মানুষের কত রকম আয়োজন। কিন্তু যদি মল্লযুদ্ধ করে বাঘকে পরাস্ত করতে হত—তা হলে বুঝতাম দোস্তের ক্যারামতি।

শিকারী এই কথার কোনো উত্তর দিলে না। শুধু নিজের জিনিস-পত্রগুলি আবার ভালো করে গুছিয়ে রাখলে।

তারপর শিকারী অরবিন্দ গুহ নিজের বন্দুকটা নিয়ে পড়ল। ভাল করে সব পার্টসগুলি খুলে খুলে পরীক্ষা করে দেখে নিল—যেন বন্দুকের কোনো ত্রুটি না থাকে।

প্যাণ্টের পকেটে কতকগুলি জ্যান্ত কার্টিজ নিয়ে নিল। মাচার ওপর কোনো মতেই সিগারেট খাওয়া চলবে না। গন্ধ পেয়ে যদি বাঘ পালিয়ে যায়।

আমজাদ কতকগুলি শুকনো খাবার একটা পাতলা ব্যাগের মধ্যে পুরে দিলে।

নৈশ ভোজন সমাধা করে যাওয়া চল্‌বেনা। তাহলে মাচার ওপর বসে ঘুম পাবে।

এখন দুই বন্ধু সন্ধ্যার আঁধারে গরম কফি আর হাল্কা ভাজাভুজি খেয়ে গল্প জমিয়ে তুল্ল।

মুংরার খবর ওরা লোক পাঠিয়ে একবার নিয়েছে। লোকটা সারাদিন ধরে কিছুই দাঁতে কাটে নি। শুধু নিজের ঝুপ্ড়িতে শুয়ে আর্তনাদ করেছে আর পাগলের মতো গড়াগড়ি দিয়েছে।

ক্রমে সারা অঞ্চলটা অন্ধকারে ঢেকে ফেলল। ঝোপে-ঝাড়ে চারদিকে জোনাকি জ্বলতে লাগল। ডোবা গুলির ভেতরে ব্যাঙের ডাকও শোনা যেতে লাগল।

আরো কিছুটা রাত বাড়লে—দুই বন্ধু জিপে করে রওনা হল। এবার জিপটা বেশ দূরে রাখা হল। কারণ জিপের শব্দ শুনলে বাঘ ঘাব্ড়ে যেতে পারে। আর শান্ত বনভূমিকে সচকিত করা শিকারীর উদ্দেশ্য নয়।

শিকারী ভালো করে আবার দেখে নিল—টর্চ আর বন্দুকটা সঙ্গে আছে কিনা।

বেশ খানিকটা পথ ওরা হেঁটে এগিয়ে গেল। অশ্বত্থ গাছের মাচা থেকে একটি দড়ির সিঁড়ি ঝুলিয়ে রাখা আছে। এই দড়ির সিঁড়ি বেয়ে শিকারী ওপরে উঠে যাবে। তারপর মাচায় বসে দড়ির সিঁড়িটা ওপরে টেনে নেবে।

খান সায়েবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নীরবে শিকারী ওপরে উঠে গেল। তারপর চকিতে একবার টর্চ জ্বেলে খান সায়েবকে চলে যাবার জন্যে সঙ্কেত করল।

খান সায়েবের সঙ্গেও টর্চ আর বন্দুক আছে। দোস্তকে বন-ভূমিতে রেখে খান সায়েব চিন্তিত মনে তাবুতে ফিরে এলো। এইবার তার রাতের খানা শেষ করে শুয়ে পড়তে হবে।

কিন্তু আজ রাত্তিরে খান সায়েবেরও ভালো ঘুম হবে না। বন্ধুর বন্দুকের আওয়াজের জন্যে তাকে বিনিদ্র-রজনী যাপন করতে হবে।

তারপর বন্দুকের শব্দ শুনলেই দলবল নিয়ে বনের পথে অগ্রসর হতে হবে।

শিকারী বারবার করে সাবধান করেছে, প্রথম বন্দুকের শব্দ শুনেই যেন খান সায়েব বনের ভেতর ধাওয়া না করে। কিছুক্ষণ তাকে দ্বিতীয় ইঙ্গিতের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

ওদিকে শিকারী নীরবে অশ্বত্থ গাছের মাচার ওপর চুপচাপ বসে আছে। সিগারেট খাওয়ার উপায় নেই। বেশী নড়াচড়া করে আওয়াজ করবারও যো নেই।

এদিকে চারদিক থেকে রাশি রাশি মশা শত্রু সৈন্যের মতো শিকারীকে ছেঁকে ধরেছে।

খানিক বাদে শিকারীর বনের অন্ধকারের দিকে তাকাবার ফুরসৎ হল।

দেখতে জানলে, রাতের বনের একটা অপূর্ব শোভা আছে। অনেকক্ষণ অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকলে—অরণ্যের অন্ধকার চোখদুটি দিব্যি সহ্য করতে পারে। তখন অনেক কিছুই অন্ধকারের ভেতর দিয়েই দেখা যায়।

শিকারী একটু দূরে তাকিয়ে দেখলে, মুংলির আধা-খাওয়া দেহটি তখনো সেখানে পড়ে আছে।

গাছের তলায় বাঁধা ছাগলটি মাঝে মাঝে ব্যা-ব্যা করে করুণ আর্তনাদ করছে। একা এই বনের মাঝখানে ওর বুঝি ভয় করছে। ওকেও বোধ হয় রাশি-রাশি মশা ছেঁকে ধরেছে।

চুপচাপ বসে থেকে প্রহর গুনতে লাগল শিকারী। কয়েকটি ছোট ছোট জানোয়ার জলাশয়ের ধারে এসে জলপান করে চলে গেল।

গাছের ঝরা পাতার ওপর দিয়ে কয়েকটি হরিণ দ্রুতবেগে চলে গেল।

ওরা কাউকে দেখে কি ভয় পেয়েছে?

আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ।

খানিকক্ষণ বাদে কয়েকটি বুনো শূয়োর ঘোঁৎ-ঘোঁৎ শব্দ করতে করতে বনের আর এক দিকে পালিয়ে গেল।

শিকারী একেবারে স্ট্যাচুর মতো বনের শোভা দেখতে লাগলো।

বনের মধ্যে পাখ্‌পাখালির কত রকম আওয়াজ শোনা যেতে লাগলো—সেটা গুনে শেষ করা যায় না।

ভোরবেলার পাখীর ডাক এক রকম। আবার গভীর রাত্তের নিশাচর পাখীর আওয়াজ অন্য রকম।

যারা রাত্তির বেলা বনে কাটায় তারা ঠিক বুঝতে পারে। শিকারী একবার ঘড়ি দেখল।

রেডিয়াম দেয়া ঘড়ি দেখার কোনো অসুবিধে নেই।

ওরে বাবা—রাত দুটো বাজে।

কত রকম প্রাণী যে এই বনে বাস করে কে গুনে দেখেছে? তাছাড়া পাখ্‌-পাখালির সংখ্যাও অগুন্তি—

হঠাৎ মনে হল সারা বনটা যেন দম বন্ধ করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ল।

কেউ কি এই দিক পানে আসছে?

নিশাচর পাখীদের ডাকও বন্ধ হয়ে গেল।

শুকনো পাতার ওপর দিয়ে কার আলতো পায়ের আওয়াজ। মনে হল একটা লম্বা জীব মুংলির আধ-খাওয়া দেহের পাশে এসে দাঁড়ালো।

শিকারী এইবার সচেতন হয়ে বন্দুক মুঠো করে ধরল। তারপর এক ঝিলিকের মতো টর্চটা জ্বালিয়ে ফেলল।

ঠিক যা ভেবেছে তাই।

বিরাট এক বাঘ মুংলির আধ-খাওয়া দেহের পাশে খাড়া। সঙ্গে সঙ্গে শিকারীর ডবল ব্যারেল গান আগুন ছড়িয়ে দিল।

বাঘের গলার একটা দারুণ আর্তনাদ। সঙ্গে সঙ্গে বাঘকে লক্ষ্য করে আরো একটা গুলী···

একটা উঁচু লাফ দিয়ে বাঘটা বিরাট শব্দ করে মাটিতে পড়ে গেল।

নাঃ আর কোনো সন্দেহ নেই।

খান সাহেব লোকজন নিয়ে বনের দিকে এগিয়ে আসছে।

তাদের কণ্ঠে উচ্চ কোলাহল—

আর হাতে হাতে জ্বলন্ত মশাল !!

কঞ্জুষের লণ্ঠন

বিশ্বম্ভর আর বটুকেশ্বর একই সঙ্গে প্রত্যহ ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে ডালহোসী স্কোয়ারের চাকরী বজায় রাখে।

বিরাটির এক কলোনীতে ওরা ডেরা বেঁধেছে। ষ্টেশন থেকে বেশ খানিকটা দূর। ওরা দুজনে যে অফিসে চাকরী করে সেখানকার বড় বাবু বড় দু'দে লোক। তিনি কি শীত—কি গ্রীষ্ম—সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার আগে চেয়ার থেকে ওঠেন না। ফলে অফিসের কেরাণী কুলকে সেই দিকে তাকিয়ে ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হয়।

নাটমঞ্চ থেকে বড়বাবুর নিষ্ক্রমণের পর ওরা সবাই পড়ি-কি-মরি করে ছোটে শেয়ালদ' স্টেশনে। সেখানে আগে এখানে-ওখানে ঘুরে পরের দিনের বাজার পর্ব সমাধা করতে হয়। তবে ত ট্রেনের কোলে—এতটুকু স্থান সংগ্রহের জন্যে ঝুলোঝুলি। জীবন-সংগ্রামে প্রত্যহ এই একই পার্ট প্লে করতে করতে ওরা বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছে। নতুন নাটকে নয়া ভূমিকা লাভের কোনো আশা নেই। তাই এখন প্রম্পটারের প্রয়োজন হয় না। তোতাপাখীর মতো একই পার্ট প্রত্যহ নির্ভুলভাবে প্লে করে যেতে পারে।

কোন বিশেষ লোকটির কাছ থেকে আনাজ-তরকারী কিনতে হবে, কোন মেছুনীর কাছে মাছ পাওয়া যাবে, কোথায় মিলবে রোগা মেয়েটির জন্যে বার্লি আর বিস্কুট—এসব ব্যাপার আজ বটুকেশ্বরের কাছে শত রজনীর অভিনয় করা পার্টের মতই সহজ। এমন কি ক'পা চলে কোন বিশেষ কামরাটিতে তাদের তাসের আসর বসবে—সেটাও যেন ডাল-ভাত খাওয়ার মতো মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু একটা অসুবিধের হাত থেকে ওরা কিছুতেই রেহাই পায়নি। শুক্ল পক্ষে অবশ্য সে কথা আদপেই ওঠে না। কেন না—

সরকারী চেরাগ জ্বালা থাকে আকাশে। পথ চলতে কোন অসুবিধেই হয় না। এর পর যেই কৃষ্ণপক্ষ সুরু হয়—তখুনি স্টেশন থেকে বেরিয়ে মহা অসুবিধেয় পড়ে দুটি বন্ধু। এবড়ো খেবড়ো রাস্তা, কোথাও গর্ত, কোথাও বা খোয়ার স্তূপ। পদে পদে হোঁচট খেয়ে পথ চলতে হয় দু'জনকে। তাই হাত ধরাধরি করে অনেক বিবেচনা করে ওরা পা ফেলে। তাতেও রেহাই নেই। আচমকা ধাক্কা খেয়ে অনেক সময় ব্যাগের আনাজ তরকারী মাটিতে গড়াগড়ি যায়। সেগুলি কুড়িয়ে নিতে হলে আবার পকেট থেকে দেশলাই বের করে আলো জ্বেলে তার অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করতে হয়। এমনি হেনস্তা চলতে থাকে মাসের পনেরটা দিন।

সামান্য কেরাণী জীবন। একটা ভালো টর্চ যে কিনবে—মাসের শেষে পয়সাও পকেটে অবশিষ্ট থাকে না।

যারা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে—তাদের একটা সুবিধে এই যে, এক নাটকে নফরের ভূমিকায় দেখা দিলেও পরবর্তী নাটকে রাজার ভূমিকা লাভের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু বিশ্বম্ভর বটুকেশ্বরের বেলাতেই শুধু ভদ্রলোকের একই কথা!

নিছকই শুধু কেরাণী!

রূপসজ্জা পরিবর্তনের সুযোগই তারা পেলে না কোন দিন।

এমনিভাবে থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড় প্রণালীতে তাদের জীবন একই ধারায় প্রবাহিত হচ্ছিল। খুব সকালে গো-গ্রাসে গেলা থেকে সুরু করে রাত দশটায় বিছানার কোলে ঢলে পড়া পর্যন্ত ওদের মনের আকাশে কখনো সোনালী মেঘের আনাগোনা সুরু হয় না!

এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন ফিরতি ট্রেনে দেখা গেল তাদের সহযাত্রী কঞ্জুষ কাঞ্জিলাল একটি ঝক্‌ঝকে লণ্ঠন কিনে ফেলেছে।

কঞ্জুষ কাঞ্জিলালের একটু পরিচয় পাঠক-পাঠিকাদের কাছে প্রদান করা সর্বতোভাবে যুক্তিসঙ্গত বলেই অনুমিত হচ্ছে।

ভদ্রলোক নামে আর কাজে কোনো তফাৎ রাখেননি। তাই পিতৃদত্ত নামটা কখন কোন ফাঁকে উড়ে গিয়ে জনগণ-প্রদত্ত নামটাই স্থায়ী হয়েছে সেকথা সে নিজেও ভালো করে সন তারিখ বজায় রেখে বলতে পারবে না।

কঞ্জুষ কাঞ্জিলাল সারা জীবন জমানোর তপস্যা করেছে বলে অর্থ তাকে ফাঁকি দেয় নি। সিন্দুকের মধ্যে মৌরসী পাট্টা করে মজ্‌লিস বসিয়েছে তারা। টাকা পয়সাগুলি ভেতরে ঢোকবার সহজ পন্থা অতি সহজেই আয়ত্ত করে নিয়েছে। কিন্তু অভিমন্যুর মতো চক্রব্যূহ ভেদ করে বেরুবার কৌশল তারা অবগত নয়। তাই ওরা দিব্যি বহাল তবিয়তে ছানা পোনা নিয়ে সিন্দুকের মধ্যেই ক্রমবর্ধমান।

শোনা যায় কঞ্জুষ কাঞ্জিলাল মাথায় মাখবার তেলের বোতলে ওষুধের শিশির দাগ বসিয়ে রাখে। প্রত্যহ এক ফোঁটা এদিক ওদিক হবার উপায় নেই।



সেই কঞ্জুষ কাঞ্জিলাল যখন একটা নতুন লণ্ঠন কিনে বসল তখন অতি সহজেই অনুমান করা চলে যে, প্রত্যেক ফোঁটা কেরোসিন তেলের হিসেব সঙ্গোপনে রাখা আছে।

একদিন অফিস ফেরৎ পথে দারুণ অন্ধকার করে এলো।

বিশ্বম্ভর মুখ কাচুমাচু করে ব্যগ্র মিনতি জানালে, কঞ্জুষদা, এই আঁধারে পথ চলা মুস্কিল হবে। তোমার লণ্ঠন দিয়ে আমাদের একটু এগিয়ে দেবে?

ঠোঁট বাঁকিয়ে কঞ্জুষ উত্তর দিলে, না ভাই, এই অনুরোধটি কোরো না। লণ্ঠনে মাপা তেল আছে। তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসতে আসতে আলো নিভে যাবে। তখন আমায় সামলাবে কে?

পাছে অন্য কোনো অনুরোধ আসে সেই ভয়ে কঞ্জুষ লম্বা লম্বা পা ফেলতে লাগলো।

এইবার বটুকেশ্বর ফোঁড়ন কাটলে, কেমন হল ত। কেন মিছামিছি গাল বাড়িয়ে চড় খেতে যাওয়া। ওই কঞ্জুষ কাঞ্জিলাল আমাদের লণ্ঠন ধরে এগিয়ে দেবে? এ জন্মে কোনো আশা নেই। জন্ম পালটে নিলে যদি হয়।

ওর কথা শুনে বিশ্বম্ভর ফিক ফিক করে হাস্‌তে লাগ্‌লো। তারপর বল্লে, আচ্ছা, বাজি রাখ্‌বি আয়। ওই কঞ্জুষ কাঞ্জিলাল প্রত্যহ নিজে আগ্রহ করে লণ্ঠন নিয়ে আমার বাড়ীর দোর গোড়ায় পৌঁছে দেবে। তাহলে?

কথাটা লুফে নিয়ে বটুকেশ্বর বল্লে, তাহলে একদিন তোকে ভরপেট খাইয়ে দেবো—কল্‌কাতার কোনো নামকরা রেস্টুরেণ্টে।

বিশ্বম্ভর উল্লসিত হয়ে উত্তর দিলে প্রতিজ্ঞার কথাটা মনে থাকে যেন।

এর পরদিনই ট্রেনে ফিরতি পথে। বিশ্বম্ভরই প্রথমে কাঞ্জিলালের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল। বল্লে, আচ্ছা কঞ্জুষদা, তোমার চেহারাটা আজ এমন শুক্‌নো-শুক্‌নো দেখাচ্ছে কেন?

কাঞ্জিলাল যেন এই জাতীয় একটি সহানুভূতিসূচক কথারই প্রত্যাশা করছিল মনে মনে। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে উত্তর দিলে, আর বল কেন ভাই, প্রাণে এতটুকু শান্তি নেই। গিন্নি বাতে

একেবারে পঙ্গু হয়ে পড়েছে। মেয়েটা ধুম্‌সি হয়ে ঘরেই বসে রইল, একটা বর জোটাতে পারছিনে। সবই আমার অদৃষ্ট।

বটুকেশ্বর বলে, কেন দাদা, তোমার ত' অনেক টাকা। ভাত ছড়ালে আজকের দিনে কাকের অভাব কি ?

বিশ্বম্ভরের গলায় সঙ্গে সঙ্গে আরো আন্তরিকতা ফুটে উঠল। বল্লে, তোমার মেয়ের বিয়ের ব্যাপার। তা আমায় একদিন ডেকে বলোনি কেন ? আমার জানা-শোনা সব রকম পাত্রই ত' আছে। তুমি যদি বলো আমি দেখতে পারি।

একটা ডুবে যাওয়া লোক হাতের কাছে খড়-কুটো পেলেও যেমন আঁকড়ে ধরে, কাঞ্জিলাল তেমনি আগ্রহ সহকারে বিশ্বম্ভরের হাত চেপে ধরল। তার মুখে-চোখে মিনতির ছাপ সুস্পষ্ট। বল্লে, তোমরা আপনার জন আশে-পাশে আছ। সেটা কি কম বল ভরসা! আমার মেয়ের জন্য তোমরা চেষ্টা করবে না ত' করবে কে ? তবে কি জানো ভায়া, তোমাদের কাছে ত লুকিয়ে লাভ নেই মেয়েটা দিন দিন ফুলে যেন গুজরাটি হাতি হয়ে যাচ্ছে। যেমন গিন্নি ফুলছে বাতে,— তেমনি মেয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে ফুলছে যেন 'কম্পিটিসান' করে। অনেক সময় আমি বসে বসে ভাবি—এই মেয়ের বর কি সত্যি জুটবে ?

বিশ্বম্ভর উৎসাহিত হয়ে উত্তর দিলে, তুমি কিছু ভেবোনা, কাঞ্জিলালদা। গুজরাটি হাতি—তাতে হয়েছে কি ? আসামী গণ্ডারেরও ত অভাব নেই। সব রকম বর আমার হাতে আছে। আমি একেবারে রাজযোটক করিয়ে দেবো। তুমি দেখে নিও দাদা!

কাঞ্জিলালের কালচে-পড়া মুখে একটা আলগা হাসি দেখা গেল। বিরাটিতে পৌঁছে আগ্রহ করে বল্লে, এই অন্ধকার রাত্তিরে তোমাদের বড্ড কষ্ট হবে ভায়া,—চলো, লণ্ঠন ধরে আমি তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসি—

বিশ্বম্ভর—বটুকেশ্বরের পিঠে একটা চিমটি কেটে—অস্ফুটকণ্ঠে বল্লে, এইত' সবে প্রথম কিস্তি।

এর পরদিন থেকে বিশ্বম্ভর নানা জাতীয় বরের ফিরিস্তি দাখিল করতে লাগলো কঞ্জুষের কাছে।

কাঞ্জিলাল যত শোনে—তত উৎসাহিত হয়ে ওঠে। আগ্রহ করে প্রত্যহ ফিরতি পথে লণ্ঠন ধরে ওদের এগিয়ে দেয়।

সত্যি, গল্প জমাবার কায়দাটী ভালো রকমই জানা আছে বিশ্বম্ভরের। ওর কথা শুনে মনে হয় বরগুলি যেন লেবেল আঁটা অবস্থায় শো-কেসে সাজানো আছে। উপযুক্ত যৌতুক দিয়ে হাতে তুলে নিলেই হল।

সেদিন শনিবার। তাড়াতাড়ি ফেরার পালা। সকলের সঙ্গেই রবিবারের রকমারী বাজার।

কাঞ্জিলাল হঠাৎ বিশ্বম্ভরকে বলে বসল, ভায়া আসছে কাল ত' ছুটির দিন, তোমরা দুই বন্ধু দুপুর বেলা আমার ওখানেই চারটে ডাল-ভাত খেয়ে নিও। হঠাৎ বজ্রপাত হলেও দুই বন্ধু এতটা আশ্চর্য হতনা। বটুকেশ্বর তাকিয়ে দেখলে কঞ্জুষদার বাজারের থলিটা সেদিন যেন সত্যি ডবল হয়ে গেছে।

বটুকেশ্বর নিজের বিস্ময়টা আর যেন গোপন করে রাখতে পারছিল না। নিজের চোখ দুটো পিট্ পিট্ করে জিজ্ঞেস করলে, ব্যাপার কি কঞ্জুষদা, এই দুর্মূল্যের বাজারে একেবারে দুটো হাড় হাবাতেকে নেমন্তন্ন করে বসলে? এরা যে বসতে পারলে শুতে চায়।

কঞ্জুষের মুখে একটা কাষ্ঠ হাসি! উত্তর দিলে, আরে ভাই, নেমন্তন্ন কি আর আমি করলাম?—এ খোদ গিন্নির ব্যবস্থা। তোমাদের বৌঠাকরুণ বরের বিস্তারিত তালিকা নিজ কানে শুনতে চায়।

বিশ্বম্ভর চট্ করে বটুকেশ্বরের ঘাড়ে একটা চিমটি কেটে ফিস্ ফিস্ করে টিপ্পনী কাট্‌লে—এই দুই কিস্তি।

সেদিন কাঞ্জিলালের বাড়ী দুপুর বেলায় আহারটা সত্যি দারুণ

হয়েছিল। তেতো, শাক, ছঁ্যাচড়া থেকে সুরু করে পোলাও মাংস ঘুরে একেবারে দই মিষ্টি অবধি।

তা' কাঞ্জিলাল গৃহিণী রাঁধেন ভালো। প্রত্যেকটি পদের স্বোয়াদ হয়েছে অপূর্ব। দুই বন্ধু একেবারে চেটেপুটে থালা সাফ্ করে ফেলেছে।

আস্বার সময় কাঞ্জিলাল-গৃহিণাকে বিশ্বম্ভর গর্বভরে বলে এসেছে, —বৌঠান আপনি কিছু ভাববেন না। আমার পিসতুতো সম্বন্ধীর বড় ছেলে—একেবারে হীরের টুকরো। সম্প্রতি জার্মানী থেকে ফিরে টাটার অফিসার হয়েছে। আমি বল্লে আর 'না' বলতে পারবে না। আপনার মেয়ে গজাননীর বিয়ে আমি ওইখানেই ঠিক করে দেবো।

কাঞ্জিলাল-গৃহিণীর চোখদুটো অতি আনন্দে আরো ছোট হয়ে গেল। তিনি মুখে মধু এনে বল্লেন, মাথা খাও ঠাকুরপো, এই কাশীর জর্দা দেওয়া পান দুটো মুখে পুরে দাও—

ঘড় রাস্তায় নেমে সেদিন দুই বন্ধুর হাসি। বিশ্বম্ভর কোনো রকমে হাসি চেপে মন্তব্য করলে,—জানিস বটুকেশ্বর, ঠিক মতো দুইতে পারলে সব গরুতেই দুধ দেয়।

বটুকেশ্বর মাথা নেড়ে উত্তর দিলে, হুঁ! তপ্ত পাথর টিপলে যে ঠাণ্ডা জল বেরোয় তা এই প্রথম দেখলাম।

এই ঘটনার দিন তিনেক পর একদিন বিশ্বম্ভরের মা বিশ্বম্ভরকে ডেকে বল্লেন, হ্যাঁরে বিশু, তোর আবার কে পিসতুতো সম্বন্ধী আছে, —তাঁর বড় ছেলে নাকি বিলেত ফেরৎ অফিসার? কঞ্জুষের বৌ ত যেতে আসতে আমার মাথা খেয়ে ফেল্লে। ওদের কি আজে-বাজে কথা বলে ফেলেছিস? ওই ধুমসী মেয়ের কি আর বর জুট্‌বে?

খবর শুনে বিশ্বম্ভরের গলায় যেন একটা মাছের কাঁটা আটকে গেল!

সে ঢোক গিলে মুখটা চেপে বল্লে, অ্যাঁ! তোমার কাছে বৌঠান এসেছিল বুঝি? আচ্ছা আমিই না হয় দেখা করবো'খন।

কাঞ্জিলালগৃহিণী ছেলেকে দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছিলেন বিশ্বম্ভরকে। কিন্তু আকণ্ঠ নেমন্তন্নের লোভেও সে আর ওদিক পানে পা বাড়ায় নি।

কঞ্জুষ কাঞ্জিলাল নাকি ঠিক করেছিল লণ্ঠনটা বিশ্বম্ভরের মাথাতেই ভাঙবে। কিন্তু রাগ চণ্ডাল। অসময়ে তার ক্রোধ উদ্দীপিত হওয়ায় ঘরের মেঝেতে ছুঁড়ে দিতেই সেটা নাকি ভেঙে একেবারে চুরমার হয়ে গেছে।

আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি, বিশ্বম্ভর আর বটুকেশ্বর বাড়ী ফেরবার ট্রেনটা বেমালুম বদ্‌লে ফেলেছে। লণ্ঠন আর নেমন্তন্ন —দুটোকেই ওরা সযত্নে এড়িয়ে চলেছে।

কাঞ্জিলাল গৃহিণী কিন্তু আদপেই আশা ছাড়েননি ; একদিন কি আর সাম্‌না সাম্‌নি দেখা হবে না ওদের সঙ্গে ?

ভেক

নিরিবিলি গ্রামের এক পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে টল্‌টলে জলভরা একটি ছোট নদী।

এই নদীর ধারেই কানুদাস বৈরাগীর একটি সুন্দর সাজানো আখড়া!

ঠিক তপোবন কিংবা উপবনের মতো দেখতে। সাম্‌নে সযত্ন পালিত একটি সুন্দর ফুলের বাগান। তাতে বেলি, যুঁই, টগর, গাঁদা, অপরাজিতা, গন্ধরাজ, কামিনী কত রকম ফুল ফুটে আছে।

এই প্রস্ফুটিত ফুলের সুবাসে চারিদিক ম'ম করছে।

পথিক যারা নদীর ধার দিয়ে যায়,—এই মন-মাতানো বাগানটি দেখে দু'দণ্ড থম্‌কে দাঁড়ায়!

সত্যি, এমন সুন্দর বাগান আর সারা গাঁয়ে নেই। কানুদাস বৈরাগী এত ফুলও ফোটাতে পারে!

সবাই বলে কানুদাসের হাত যাদু জানে!

কানুদাস বৈরাগী একটি চন্দনা পাখী খাঁচায় পুষেছে। সে যে কত রকম কেষ্ট কথা শোনায়—বাঁশের বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে সবাই তা শোনে।

কানুদাস বাবাজীর গোবর নিকোনো বারান্দার ওপরে লম্বালম্বি ভাবে একটি বাঁশ বাঁধা। সেই বাঁশের সঙ্গে ঝোলানো আছে—চন্দনা পাখীটি!

কানুদাস বৈরাগী সকাল সন্ধ্যায় কীর্তন গায়। তার গলা যেমন সুরে ভরা তেমনি দরাজ তার কণ্ঠস্বর। কানুদাস বৈরাগী যখন কীর্তন গায়—তার সঙ্গে সঙ্গত করে এক মৃদঙ্গবাদক। তার হাতটি বড় মিঠে।

কীর্তন গাইতে গাইতে কানুদাস মধুর মধুর আখর দেয়। আর মৃদঙ্গবাদক অদ্ভুতভাবে বোল তোলে।

দুইয়ের সাহচর্যে কীর্তন চমৎকার ভাবে জমে ওঠে।

কানুদাস বৈরাগীর গানের চাইতে তার পোষা চন্দনার কৃষ্ণকথা আরো মধুর।

এই চন্দনা কখনো বলে,—মন কৃষ্ণকথা কও—! কখনো স্বুরে বলে, রাধাকৃষ্ণ—রাধাকৃষ্ণ—রাধাকৃষ্ণ—! আগন্তুক দেখলে প্রশ্ন করে,—কে এলে গো কৃষ্ণসখা ?

গ্রামের সবাই এই চন্দনাটির মুখের বুলি শুনতে এসে ভীড় করে। মেয়েদের ভীড়ই এখানে একটু বেশী।

আর ভক্তের দল কানুদাস বৈরাগীর কীর্তন শুনে দুই নয়নে অশ্রু বইয়ে দেয়।

অনেক সময় সারা গাঁয়ের লোকের মুখে প্রশ্ন জাগে,—কে বেশী আপনার ? কীর্তন গায়ক কানুদাস, না—মধু-বুলি চন্দনা ?

মেয়েরা অবশ্য চন্দনার পক্ষেই সায় দেয়।

কানুদাস বৈরাগীর সেই বাগানে নিত্যি নতুন ফুল ফোটে—নিত্যি নতুন গান জাগে। নিত্যি নতুন স্বুর ওঠে।

একদিন গাঁয়ের লোকেরা অবাক হয়ে দেখল,—এক বৈরাগিণী এসে জুটেছে কানুদাস বৈরাগীর আখড়ায়। তাই দেখে গাঁয়ের বৃদ্ধরা কেউ কেউ ভুরু কোঁচকালো।

অপর একদল টিপ্পনী কাটলো, এইবার নব-বৃন্দাবন জমবে ভালো!

মেয়েরা বললে, বৈরাগিণীর মুখখানি বড় ঢলঢলে। অলকা তিলকা কেটে বৈরাগিণী যখন কানুদাস বৈরাগীর গা-ঘেঁষে বসে মিঠে গলায় কীর্তন ধরে—তখন—বাগানের বাঁশের বেড়ার ওধারে লোক জমে যায়।

বৈরাগিণীর নাম রাধারাণী।

আহা, কানুদাসের সঙ্গে রাধারাণীকে বড় স্বুন্দর মানায়। এতদিন কানুদাস স্বুন্দর কি কুৎসিত, লম্বা কি বেঁটে, এ সব কথা কেউ ভাবত না।

রাধারাণী আসার পর থেকে আপনা থেকেই তুলনার কথাটা এসে পড়ে।

লোকে বলে, দুই মিলে—ভারী সুন্দর জুড়ি হয়েছে। কানুদাস আর রাধারাণী—একে অন্যের পরিপূরক।

কীর্তনে ওরা কিন্তু মিলে মিশে এক হয়ে যায়। এতদিন কানু-দাসের গলার সঙ্গে রাধারাণীর গলা মিলত না,—সেটা ওরা কি করে চুপচাপ সয়ে এসেছে এইটাই আশ্চর্য।

কানু কি রাধা বিহনে থাকতে পারে? এখন গাঁয়ের মানুষ বেশ বুঝতে পেরেছে, কানুদাসের গলার সঙ্গে রাধারাণীর গলা মিশ খেয়েছে বলেই কীর্তনে এত প্রাণ এসেছে। এতকাল শুধু কানুদাসের গলা তাদের এত মজিয়েছিল কি করে ভেবে ওদের বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

মাঝে মাঝে কানুদাস আখড়া ছেড়ে দু'চার দিনের জন্যে কোথায় চলে যায়। তখন রাধারাণী মালা গাঁথে, গোপীবল্লভের পূজোর আয়োজন করে, দাঁড়ে বসা চন্দনাকে নতুন নতুন বুলি শেখায়।

কিন্তু কীর্তন গাইতে বললে রাধারাণী রাজী হয় না। মুচকি হেসে উত্তর দেয়, আগে বৈরাগী ফিরে আসুক, তখন তোমাদের প্রাণ ভরে কীর্তন শোনাব।

আসল কথা হচ্ছে, কানুদাসের ভরাট গলার সঙ্গে রাধারাণীর মিহি গলা না মিশলে—কীর্তন মধুর হয়ে ওঠে না।

আবার হঠাৎ একদিন কানুদাস আখড়ায় ফিরে আসে। রাধা-রাণীর দুই চোখে ঝিলিক ঝলে, গলায় মধুর গান জেগে ওঠে। কীর্তন আপনিই জমে ওঠে।

গাঁয়ের মানুষও আনন্দ করে গান শুনতে আসে।

বিপদে পড়লে অনেক সময় পাড়ার মেয়েরা গোপনে রাধারাণীর কাছে আসে। শোনা যায় রাধারাণী না কি অনেককে টাকাটা—

সিকিটা দিয়ে অসময়ে সাহায্য করে। কিন্তু সেই ঋণ শোধ করতে গেলে রাধারাণী ফেরৎ নেয় না।

দিব্যি মুখ মুছে বলে, আমরা কৃষ্ণের দাস। কৃষ্ণই তোমায় অসময়ে দেখেছেন। বিপদে ত্রাণ করেছেন। ও-টাকা আমি ফেরৎ নিই কি করে বলো। কৃষ্ণের দান কৃষ্ণ পূজায় ব্যয় করো।

রাধারাণীর গুণের কথা বলে মেয়েরা কূল পায় না! আহা, মুখে যেমন মধু, মনটাও দরদে ভরা।

একদিন গভীর রাত্রে কিসের কোলাহলে গ্রামবাসীর আচমকা ঘুম ভেঙে গেল।

কানুদাস বৈরাগীর আখড়া থেকেই গোলমালটা শোনা যাচ্ছে। কানুদাস আর রাধারাণী কি বিপদে পড়ল?

গ্রাম সুদ্ধ মানুষ সেইখানে গিয়ে ভেঙে পড়ল। কিন্তু যে দৃশ্য তারা দেখল, তাতে তাদের একেবারে চক্ষুস্থির!

একদল পুলিস এসে সারা আখড়াটা একেবারে তচ্‌নচ্‌ করে ফেলেছে। ফুলের গাছগুলো ভারি বুটের দাপটে মাটিতে নেতিয়ে পড়েছে।

কানুদাসকে উঠোনোর এক কোণে পিঠমোড়া করে বাঁধা অবস্থায় দেখা গেল।

কানুদাসের শোবার ঘরের মেঝে খুঁড়ে পুলিসের দল না কি অনেক টাকাকড়ি, গয়না আর অস্ত্রশস্ত্র খুঁজে পেয়েছে। ওকে এক্ষুণি সদরে চালান করে দেয়া হবে। ডাকাতের সর্দার না কি কানুদাস।

কিন্তু রাধারাণীকে কোথায়ও খুঁজে পাওয়া গেল না।

এই ডাকাত সর্দারের কি করে ঘর করত রাধারাণী, এ কথা ভেবে মেয়েদের আর বিস্ময়ের পরিসীমা রইল না! আহা, অমন ঢলঢলে মুখখানি!

কিন্তু গাঁয়ের একদল যণ্ডা-গুণ্ডা লোক প্রকাশ্যেই কানুদাসকে সমর্থন করতে লাগল।

তারা বললে, আজকের দিনে ভেক্ না নিলে না কি ভিখ মেলে না!

কানুদাস না কি আখড়া সাজিয়ে উচিত কাজই করেছে।

পুলিসের দল কারো কথায় ভ্রূক্ষেপ করল না, পিঠমোড়া অবস্থায় তাকে জীপে চাপিয়ে নিয়ে গাঁয়ের পথে ধূলো উড়িয়ে চলে গেল।

শুধু কানুদাসের চন্দনাটার দিকে কেউ ফিরে তাকাল না!

কানুদাসের বারান্দায় সে শুধু ট্যাঁ-ট্যাঁ করে ডাকতে লাগল। সে ডাক যেমন কর্কশ, তেমনি বিরক্তিকর। তার মুখে আজ কোনো কৃষ্ণকথার বুলি ফুটল না।

কানুদাসের সঙ্গে সেও কি ভেক নিয়েছিল?

শতদলবাসিনীর অভিশপ্ত সাতনরী হার

মামা-ভাগ্নে ইতিহাস নিয়েই মেতে আছে। মদন মামা আর ভোগ্লা ভাগ্নে।

মদন মামা চিরকাল ইতিহাসের উঁচু ধাপের ছাত্র। সম্প্রতি সে ইতিহাসে এম-এ পাস করেছে। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস খুঁজে খুঁজে পড়ে।

ভাগ্নে ভোগ্লাকেও নিজের শাগরেদ করে নিয়েছে। সেও কম যায় না।

মহেঞ্জদারোর প্রাচীন ইতিহাস, অজন্তা-ইলোরা আবিষ্কারের অলৌকিক কাহিনী, কোনারকের সূর্যমন্দির প্রতিষ্ঠার প্রাচীন ইতিহাস খুঁজে খুঁজে আবিষ্কার করে। ইতিহাসের পাতা থেকে নতুন কিছুর সন্ধান এখন ওদের জীবনের একমাত্র আদর্শ।

এ ব্যাপারে মামা-ভাগ্নের ভারী মিল! মদন মামা প্রায়ই হাসি-হাসি মুখে বলে থাকে,—বুঝলি ভোগ্লা ভাগ্নে, মামা-ভাগ্নে যেখানে, আপদ নেই সেখানে! এই ইতিহাসের আলোচনা করতে করতেই আমরাও একদিন ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে থাকবো। ওরা মামা-ভাগ্নে মিলে বাড়িতে একটি ইতিহাসের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের গ্রন্থাগার স্থাপন করেছে। ওরা যখন সকল রকমে ইতিহাস নিয়ে মশগুল, সেই সময় একটি বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত খবরটি প্রকাশিত হল—

"পশ্চিম বাঙলা-বিহারের উত্তর সীমান্ত অঞ্চলে, ভুটানে যাবার পথে এক গভীর জঙ্গলের তলদেশে একটি ভগ্ন রাজপুরী আবিষ্কৃত হয়েছে। এশিয়াটিক সোসাইটির কয়েকটি ছাত্র ঐতিহাসিক প্রমোদ ভ্রমণ করতে এসে এই জঙ্গলে কয়েকটি রাত্রি অতিবাহিত করে। তার ভেতর কয়েকজন উৎসাহী ছাত্র শাবল দিয়ে একটি পুরাতন মূর্তি

খনন করতে গিয়ে এই ভগ্ন রাজপুরীর অংশবিশেষ আবিষ্কার করে। ছাত্রদল সেখানে একটি তাম্রের প্লেট খুঁজে পায়। অদ্ভুত সব ছবি ও লিপি রয়েছে সেই তাম্রশাসনে। এখন পর্যন্ত কেউ সেই লেখা ও ছবির পাঠোদ্ধার করতে পারে নি। এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইতিহাসের পণ্ডিতগণ এই নিয়ে গবেষণা শুরু করেছেন।"

সেদিন সকালে ভোগ্‌লা ভাগ্‌নে সবে এক কাপ কফিতে চুমুক দিয়েছে, এমন সময় মদন মামা কাগজটি দেখিয়ে হুংকার দিয়ে উঠল, ভাগ্‌নে, তোমার ওই কফির কাপ অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু ভূটান সীমান্তের গোপন ইতিহাস কোনো মতেই অপেক্ষা করবে না।

সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজটি ছুড়ে দিল ভাগ্‌নের দিকে। ভাগ্‌নেও তৈরী ছেলে। ধরে আনতে বল্লে বেঁধে নিয়ে আসে। খবরটিতে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই সে কইলে, আচ্ছা মামা, আমরা ওখানে কবে রওনা হচ্ছি? মুচকি হেসে মামা উত্তর দিলে, ধর, তৈরী হতে একদিন। আমরা আগামী কালই এই আবিষ্কারের কাজে 'দুর্গা' বলে রওনা হতে পারি।

সঙ্গে সঙ্গে ভোগ্‌লা ভাগ্‌নেও রাজী। মদন মামার একটি খুব শক্ত জীপ গাড়ি আছে। যে কোনো খারাপ রাস্তায় খর্ খর্ করে এগিয়ে যেতে পারে। সেই জীপের ভেতর পুরে নেয়া হল—ছোট একটি তাঁবু, শাবল, গাঁইতি, কোদাল ইত্যাদি—,আর প্রাণ রক্ষার জন্যে টিনের ভেতর কিছু শুকনো খাবার, টর্চ আর কিছু হাফ্‌প্যান্ট, শার্ট।

এ বিষয়ে মামা-ভাগ্‌নে একেবারে একমত। কাজ উদ্ধার করতে হলে—অকারণ ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ নেই। আয়োজন যত সহজ ও সংক্ষিপ্ত হয় ততই কাজ এগিয়ে আসে তরতর করে।

ইতিমধ্যে মদন মামা রাত জেগে একটি রাস্তার ম্যাপ তৈরি করে ফেলেছে। এশিয়াটিক সোসাইটিতে তার এক বন্ধু আছে। সে আগেকার অভিযানে ছিল। মদন মামা তার সঙ্গেও প্রয়োজনীয়

আলাপ আলোচনা করে সেই অজানা তাম্রলিপিটি দেখে এসেছে। কিন্তু কিছুই পড়তে পারে নি, তার অল্পবিস্তর জ্ঞান নিয়ে।

কলকাতায় কাকপক্ষী জাগবার বহু আগে—মামা-ভাগ্‌নে জীপ গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তখনো পুব আকাশে ছিঁটে ফোঁটা রং লাগে নি। সারা ফুটপাথ ভর্তি গৃহহীন লোকেরা ঘুমিয়ে আছে। শুধু খবরের কাগজের পিয়নদের সাইকেলের ক্রীং ক্রীং শব্দ এখানে ওখানে শোনা যাচ্ছে। চায়ের দোকানগুলিতে সবে উনুনে আগুন দিয়েছে। একটা দোকানে ওরা দুজনে দু কাপ চা খেয়ে আবার জীপে উঠে পড়ল।

ভোগ্‌লা ভাগ্‌নের গলায় সবে একটু গানের সুর এসেছিল, মদন মামা তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে কইলে, এখন আর হালকা গানের হুঁ হুঁ নয়, তামার প্লেটটার কথা ভাবছি আমি। এ কোন্ ভাষায় লেখা, ঠিক ঠাহর করতে পারছি না।

জীপ গাড়ি এগিয়ে চল্লো নির্ধারিত পথে। সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসবার কিছু আগে ওরা সেই চিহ্নিত জঙ্গলের মুখে গিয়ে হাজির হল।

ভোগ্‌লা ভাগ্‌নে কইলে, আমাদের প্রথম কাজ হবে—তাঁবুটাকে খাটিয়ে নেয়া। রাত্তিরে শোবার ব্যবস্থা আগে ঠিক করে নিতে হবে।

ছোট তাঁবু খাটাতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। মদন মামা বল্লে, এখন কিছু খেয়ে নিয়ে আমরা দিব্যি ঘুম লাগাবো। তারপর মাঝ রাত্তিরে চাঁদ উঠবে—আমি আগেই পাঁজি জেনে এসেছি। ওই সময় উঠে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়ব।

ভোগ্‌লা ভাগ্‌নে ভয়ে ভয়ে বল্লে, সেই ভগ্ন পুরীর আশে-পাশে আবার ভূত-প্রেত লুকিয়ে নেই তো?

হো-হো করে হেসে উঠল মদন মামা—ইতিহাসের ছাত্র তুই। চিরকাল ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করবি, আর তুই কিনা ভূতের ভয়ে কাবু! এর চাইতে লজ্জার কথা আর কি আছে? ছিঃ! ছিঃ!

ওরা দুটিতে শুকনো খাবার খেয়ে দিব্যি তাঁবুতে শতরঞ্চি পেতে শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুমোয় কার সাধ্যি? লক্ষ লক্ষ মশক-সৈন্য এসে ওদের আক্রমণ করল। তারা যেন তীক্ষ্ণ হুল দিয়ে বেয়নেট্ চার্জ করল দুজনকে। কার সাধ্যি আর বিছানায় শুয়ে থাকে?



মদন মামা বল্লে, দুত্তেরি তোর ঘুমের নিকুচি করেছে! উঠে পড়্ ভোগ্লা ভাগ্নে। টর্চ হাতে নে। মদন মামা নিজের রিভলভারটি প্যাণ্টের পকেটে গুঁজে রাখলে। আপন মনে বল্লে, ভূত না থাকুক, চিতা বাঘ, হায়েনা, কিংবা সাপ তো থাকতে পারে।

যেতে যেতে ওরা দেখলে, ছাত্রদলের 'একৃস্কারসনের' চিহ্ন এখানে-ওখানে তখনো ছড়িয়ে আছে। তাঁবুর খুঁটি, উনুন, ভাঙা মগ, ছেঁড়া গেঞ্জি...এখানে-ওখানে ছড়ানো-ছিটোনো। ওইগুলোই ভোগ্লার মনে সাহস এনে দিলে।

বহু পুরাতন গাছে ভর্তি এই বনটি। গাছগুলির যে বয়েস কত চট্ করে বলা মুশকিল! হাঁটতে হাঁটতে ওরা বনের আরো ভেতরে চলে গেল। টর্চ জ্বালিয়ে দেখা গেল, ভগ্নস্তূপের একটা ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে বটে!

ওরা তার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেচে,—এমন সময় বনের আরো নিবিড় অন্ধকার ভেদ করে ভেসে এলো একটা প্রাণ কাঁপানো তীক্ষ্ণ হাসি!

সে হাসি যেমন বিশ্রী তেমনি গা শিউরে ওঠা! এমন করে এত রাত্তিরে কে হাসে রে বাবা!

ভোগ্‌লা ভয়ে ভয়ে মদন মামার হাতটা জড়িয়ে ধরে কইলে, আমি তখুনি বলেছিলাম না?

মদন মামা একটা তাচ্ছিল্য দেখিয়ে কইলে, জানিস না বুঝি? হায়েনারা অমনি ক্যান্‌কেনে গলায় হাসে!

মোটকথা, হায়েনাই হাসুক কিংবা অরণ্যের কোনো অলৌকিক রহস্যই হোক্—ভোগ্‌লা ভাগ্‌নে কিন্তু আর বেশী দূর এগিয়ে যেতে সাহস পেলে না!

মদন মামা ভ্রূ কুঁচকে কইলে, ভোগ্‌লা, তুই একটা ভীতুর ডিম। এত ভয় পেলে কখনো ইতিহাসের অন্দরে প্রবেশ করা যায়? যাক্, আজ রাত্তিরের নৈশ-অভিযান ব্যর্থ হয়ে গেল। কাল সকালে উঠে সব কিছু সরেজমিনে অনুসন্ধান করতে হবে।

মামা-ভাগ্‌নে আবার তাদের শিবিরে ফিরে এলো আর অবাক কাণ্ড—অরণ্যের মশককুলের দংশনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে একেবারে গভীর নিদ্রায় ঢলে পড়ল।

পরের দিন খুব সকালবেলা মদন মামার ঘুম ভেঙে গেল। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে কইলে, ভোগ্‌লা ভাগ্‌নে শীগ্‌গির উঠে পড়। আজ আমাদের অরণ্যের রহস্য ভেদ করতেই হবে।

মামা-ভাগ্‌নে অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে রওনা হল। ওরা দু'জনে সেই ভগ্নস্তূপের চারদিকে কানামাছির মতো ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লো, কিন্তু প্রবেশের কোন পথই খুঁজে পেল না।

হতাশ হয়ে দুইজনে একটা গাছের তলায় বসে পড়ল। আকাশে রবির তেজ অগ্নিময় হয়ে উঠেছে। তবে ওদের একটা সুবিধে এই

যে, সেই ঘন অরণ্যানীর মধ্যে সূর্যকিরণও কোনো মতে ঢোকবার রাস্তা খুঁজে পেল না! পাশেই একটা ছোট্ট ঝরনা দেখা গেল। পরিশ্রান্ত হয়ে দু'জনে সেইখানে স্নান করে শুক্‌নো খাবার খেয়ে কোনো রকমে ক্ষুন্নিবৃত্তি করলে।

তারপর একান্ত আলস্যে সেই গাছের ছায়ার তলায় সবুজ তৃণের সুন্দর গালিচায় দেহ এলিয়ে দিলে।

অরণ্যের মধুর সমীরণে ওদের নিদ্রা আসতে বেশী দেরি হল না।

ওদের সেই মোহময় ঘুম যখন ভাঙল—তখন অরণ্যে সন্ধ্যের আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। ঝোপেঝাড়ে গাছের ডালে-ডালে জোনাকি পোকার দল যেন আগুনের হরির লুট ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

মদন মামা কইলে, আজ আর কিছুতে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলে চলবে না। অরণ্যের রহস্য এই রাত্রির কুহেলীর মধ্যেই উদ্‌ঘাটন করতে হবে।

ভোগ্‌লা ভাগ্‌নে মৃদু আপত্তি করতে যাচ্ছিল, কিন্তু মদন মামা তাকে এক ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলে।

তারপর সেই ভগ্ন রাজপুরীকে কেন্দ্র করে ওরা মোহাচ্ছন্নের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল।

মাকড়সা যেমন করে ঘুরে ঘুরে তার জাল বুনে তোলে, ওরা দুটিতে ঠিক সেইভাবে নিজেদের কল্পনার জাল বিস্তার করলে। কিন্তু কিছুতেই সেই রহস্যের ভেদ করতে পারলে না।

রাত্রি ক্রমে গভীর হতে থাকল।

সন্ধ্যের পাখিরা ক্লান্ত হয়ে নীড়ে আশ্রয় নিলে। অরণ্যের শ্বাপদ দলের চোখ গুলি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। কাল-প্যাঁচার দল যেন কী অশুভ-ইঙ্গিত করে আকাশপথে উড়ে চলে গেল—

বাদুড় আর চামচিকেরা এই দুই দুঃসাহসী তরুণকে আর অগ্রসর হতে নিষেধ করল—!

মাথার ওপরে কালপুরুষ কি অশুভ-ইঙ্গিতে স্তব্ধ হয়ে রইল। কিন্তু মদন মামা কইলে, মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। আজ রাত্রেই আমাকে এই রহস্যের সমাধান করতে হবে।

হঠাৎ আবার সেই প্রাণ-কাঁপানো তীক্ষ্ণ হাসি!—তাইত! কে এই নির্জন বনভূমিতে এমন করে হাসে!

মামা-ভাগ্‌নে স্তব্ধ হয়ে গাছের তলায় বসে পড়ল। ম্লান জ্যোছনা ছিল বনভূমিকে বেষ্টন করে।

এই জ্যোছনাতেই বুঝি মায়ামৃগ ঝরনার জল পান করতে মৃদু পায়ে এগিয়ে যায়।

এই মোহময় ম্লান জ্যোছনাতেই বুঝি পরীর দল ঝরনার জলে সাঁতার কাটতে আসে।

মামা ভাগ্‌নে মোহাচ্ছন্নের মতো সেইদিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল।

কী আশ্চর্য! ওদের চোখের সামনে একটা পাতলা কুয়াশা হালকা মেঘের মতো এগিয়ে এলো। তারপর সেই পাতলা কুয়াশা একটি অলৌকিক মূর্তি পরিগ্রহ করল। পরিষ্কার কিছু বোঝা যায় না। কিন্তু আবছা মূর্তিটা ওদের সামনে বনভূমির রহস্যকে আরো জটিলতর করে তুল্‌ল। ক্রমে দীর্ঘতর হল সেই মূর্তি। মূর্তিটির খাটো কেশ। মাথার পেছনে একটি শিখা। গলায় ঝুলছে সাদা ধপ্‌ধপে একটি পৈতে। মূর্তিটি যেন কুয়াশার মতো বন-ভূমিকে ছাড়িয়ে উর্ধ্ব আকাশে তার শির উঁচু করে রইল।

মামা ভাগ্‌নের চোখে পলক পড়ে না। ওরা দুটিতে সম্মোহিত হয়ে সেই দিকে চেয়ে রইল।

আবার সেই প্রাণ-কাঁপানো খিল্‌খিলে হাসি!—হাসি পায় তোদের কথা শুনে।

তোরা দুই পুঁচকে ছেলে এই ভগ্নপুরীর রহস্য-ভেদ করবি!

সাধ্যি কি তোদের?

এই একমাত্র সৈন্ধব পণ্ডিত ছাড়া সেই অরণ্যের রহস্যের কথা কেউ জানে না।

মদন মামা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলে, আপনি কি অশরীরী আত্মা ?

কুয়াশার মতো আবছা মূর্তি উত্তর দিলে, আমি কে ? আমি হচ্ছি সৈন্ধব পণ্ডিত এই রাজ্যের মহারাজ সুবিক্রম সামন্ত— আমি তাঁর পুরোহিত সৈন্ধব পণ্ডিত। আমি মহারাজকে সেই অশুভ দিনে মৃগয়ায় যেতে নিষেধ করেছিলাম। দিনটি ছিল সত্যি অমঙ্গলের কালো ছায়ায় ঢাকা। আমি বারণ করলাম, মহারাজ সুবিক্রম সামন্ত, আজকের দিনে আপনি মৃগয়ায় যাবেন না। হয়তো গ্রহের কোপে আপনার রাজপুরীর কোনো অমঙ্গল হতে পারে।

মৃদু হাস্য করলেন সুবিক্রম সামন্ত। শুধু বললেন, আমি মৃগয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়েছি। কোনো বাধাই আজ আমাকে বিচলিত করতে পারবে না। আমি মহারাজকে সৈন্যসামন্ত সঙ্গে নিয়ে যেতে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু মহারাজ আমার সে কথায়ও কর্ণপাত করলেন না। একাকী তীরধনু নিয়ে চলে গেলেন গভীর অরণ্যে হরিণ শিকার করবার জন্যে।

সেই দিনটি মঙ্গলগ্রহ ছিল মহারাজের বৈরী। সুতরাং হরিণ শিকার করতে গিয়ে তিনি এক মায়ামৃগ সঙ্গে নিয়ে রাজপুরীতে ফিরে এলেন।

—মায়ামৃগ ?

—হ্যাঁ, মায়ামৃগ।

সৈন্ধব পণ্ডিতের কণ্ঠে এক অলৌকিক হাসি।

—তোরা শুনতে চাস সেই মায়ামৃগের কাহিনী ?

—হ্যাঁ, আমরা শুনতে চাই। যতই অলৌকিক হোক, সত্য ঘটনা আমরা সম্যক অবগত হতে চাই—

—আচ্ছা, তবে চুপচাপ বোস্ এখানে। সেই অলৌকিক অমঙ্গল কাহিনী এক মাত্র সৈন্ধব পণ্ডিতই জানে।

—মহারাজ তো চলে গেলেন গভীর অরণ্যে। সারাদিন ঘুরে ঘুরে একটি হরিণেরও দেখা পেলেন না।

শ্রান্ত, ক্লান্ত, তৃষ্ণার্ত হয়ে একটি ঝরনার ধারে গিয়ে উপস্থিত হলেন মহারাজ।

সেই ঝরনার ধারে বসে এক অপরূপা প্রস্তর মূর্তি। যেন পাথর কুঁদে কোনো ভাস্কর নির্মাণ করেছে।

মুগ্ধ বিস্ময়ে মহারাজ সেই দিকে অপলক নেত্রে চেয়ে রইলেন। এত নিখুঁত মূর্তি এই বনভূমিতে কে নির্মাণ করল ?

অবশেষে সেই প্রস্তর মূর্তিতে প্রাণ সঞ্চারিত হল। অজানা এক ভাষায় সেই নারীমূর্তি গান গেয়ে উঠল। মহারাজ বিস্মিত ও চমকিত হলেন।

প্রস্তরের মতো কৃষ্ণবর্ণা সেই অপরূপা নারীমূর্তিকে নিয়ে মহারাজ রাজপুরীতে ফিরে এলেন।

শনি-মঙ্গলের এক অশুভ-সম্মেলনে এই অমঙ্গল ঘটনা সম্পাদিত হল। একথা একমাত্র এই সৈন্ধব পণ্ডিতই গণনা করে জানতে পেরেছিল। তারপর ?

মেয়েটির নাম মুংলী। জংলী কোনো এক আদিবাসীর মেয়ে। রূপ ছিল, কিন্তু একেবারে ঘোর কৃষ্ণবর্ণা। সেই মুংলীর সঙ্গে রাজপুরীতে আশ্রয় লাভ করল—এক কুৎসিত দর্শনা লোলচর্মা বৃদ্ধা। তার নাম শোনা গেল হেলেঞ্চা বুড়ী।

আসলে এই হেলেঞ্চা বুড়ী ছিল এক ডাইনী। এই হেলেঞ্চা বুড়ী বহু রকম তুকতাক আর বনের গাছ-গাছড়ার প্রয়োগবিধি জানত। আর তাই দিয়ে মানুষের অকল্যাণ-সাধনের ব্রত বেশ ভালোভাবেই আয়ত্ত করেছিল।

মহারাজ কিন্তু আমার নিষেধ শুনলেন না। এই কৃষ্ণা রূপসী

মুংলীকে পাটরানীর পদে অভিষিক্ত করলেন, আর তার নতুন করে নামকরণ করলেন—শতদলবাসিনী।

মহারাজ পুরীর লক্ষ্মীকে বিদায় দান করে এক অশুভক্ষণে অলক্ষ্মীর আরাধনা আরম্ভ করলেন।

শতদলবাসিনীর অনুরোধে ও আবদারে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে রাজ্য ছেড়ে চলে গেলেন।

মহারাজ সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করলেন না। একদিন হেলেঞ্চা বুড়ীর প্ররোচনায় শতদলবাসিনী মহারাজের কাছে এক সাতনরী হার চেয়ে বসলেন।

শতদলবাসিনীকে মহারাজের তখন অদেয় কিছুই ছিল না। স্বর্ণকার ডেকে সেই সাতনরী হারের পরিকল্পনা বুঝিয়ে দেয়া হল। আসলে হেলেঞ্চা বুড়ী স্বর্ণকারকে বলে দিল, এই সাতনরী হারের মধ্যে একটি গোপন গহ্বর থাকবে।

হেলেঞ্চা বুড়ীর উদ্দেশ্য হল, বনের লতাপাতায় তুক্‌তাক করে হারের সেই গোপন গহ্বরে লুকিয়ে রাখা। সেই সাতনরী হার শতদলবাসিনী যাকে উপহার প্রদান করবে, আর যে সেই সাতনরী হার গলায় দোলাবে তারই সর্বনাশ হবে।

এই সর্বনাশা পরিকল্পনা সর্বতোভাবে সেই হেলেঞ্চা বুড়ীর।

আমি সৈন্ধব পণ্ডিত।

আমার চোখকে ফাঁকি দেবে এমন সাধ্যি সেই হেলেঞ্চা বুড়ীর ছিল না।

আমি মহারাজকে একদিন গোপনে পূজোর ঘরে আহ্বান করে শতদলবাসিনী ও হেলেঞ্চা বুড়ীকে বনে পরিত্যাগ করবার জন্য সানুনয় অনুরোধ জানলাম।

কিন্তু যার মনে সর্বনাশের বিষাণ বেজে উঠেছে সে সৎপরামর্শ শুনবে কেন?

মহারাজ আমার সেই অনুরোধ বালকের খেয়াল মনে করে উপেক্ষা করলেন।

এক সর্বনাশের কালো ছায়া নেমে এলো সুবিক্রম সামন্তর বিরাট রাজপুরীর শীর্ষ দেশে।

তারপর শুরু হল হেলেঞ্চা বুড়ীর সেই অশুভ সর্বনাশা ব্রত।

তারই প্ররোচনায় রাজপুরীর এক এক জন গৃহলক্ষ্মীকে শতদল-বাসিনী সাতনরী হার উপহার দিলে।

আমি সৈন্ধব পণ্ডিত—রাজ্যের পুরোহিত, আমার চোখের ওপর দেখতে পেলাম—

রাজকন্যা সেই সাতনরী গলায় পরে শুকিয়ে গেলেন।

রাজার যতগুলি ভাই ছিল—তাদের সহধর্মিণীরা ছিল রাজ্যের মূর্তিমতী লক্ষ্মী প্রতিমা—

কিন্তু তাদের দিকে চোখ পড়তে শতদলবাসিনীর দুই চোখ প্রতিহিংসায় যেন জ্বলে যেতো।

একে একে আদর করে শতদলবাসিনী তার নিভৃত প্রকোষ্ঠে এক একজন গৃহলক্ষ্মীকে আহ্বান জানাতেন, আর তার কণ্ঠে পরিয়ে দিতেন—এই অভিশপ্ত সাতনরী হার।

এই হার গলায় দুলিয়ে একে একে রাজ্যের গৃহলক্ষ্মীরা অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

শতদলবাসিনীর অধরে তখন কুটিল হাসি! হেলেঞ্চা বুড়ীর ফোকলা দাঁতে ফিক্‌ফিকে হাসি যেন কোন সর্বনাশের নেশা জাগিয়ে দিয়েছে!

এইভাবে আমি রাজ্যের পুরোহিত চোখের ওপর দেখ্‌তে পেলাম।

—হাতিশালে হাতি গেল—

—ঘোড়াশালে ঘোড়া মরল—

—গোশালায় গাভীর দুধ শুকিয়ে গেল—

—রাজ্যের ফুল ঝরে গেল—

—বনের ফল শুকিয়ে এলো—

—জলাশয়ের জল কাদা হল—

—যে বাগানে সর্বক্ষণ কোকিলের গান শোনা যেত, সেখানে কর্কশ কাকের ডাক কান ঝালাপালা করে তুললো—।

—মন্দিরে-মন্দিরে কাঁসর-ঘণ্টা বন্ধ হয়ে গেল।

—দেবতার স্থানে আর স্তোত্র শোনা যায় না!

—অতিথিশালায় কোন অতিথি আসে না—

—ভিখিরীরা ভিক্ষা চায় না—

তবু কিন্তু রাজার চেতনা হল না। রাজপুরীর রক্ষীরা একদিন প্রাণ হারালো—। অভিশপ্ত রাজপুরীর মাথায় শকুনির কান্না শোনা গেল!

সেদিন গভীর রাত্রে রাজার চোখে কিছুতেই ঘুম আস্‌ছে না!

—সংগীত স্তব্ধ হয়েছে রাজপুরীতে—

—যন্ত্রীদল কখন বিদায় নিয়েছে—

নূপুরের ধ্বনি আর শোনা যায় না—

—ফুলের সৌরভ কি আকাশে মিলিয়ে গেল? রাজা রাজশয্যার ওপর মোহাচ্ছন্নের মতো স্তব্ধ হয়ে প্রায় অচেতন!

মহারাজার হঠাৎ মনে হল,—তাঁর শিয়রে কে যেন ফিস্‌ফিস্‌ করে মন্তর পড়ছে।

চমকে উঠে মহারাজ চোখ মেলে সেই দিকে তাকালেন।

হেলেঞ্চা বুড়ীর দুই চোখে কি দুরভিসন্ধি!

সে শতদলবাসিনীকে ইঙ্গিত করছে সেই সাতনরী হার মহারাজের গলায় পরিয়ে দিতে—

মহারাজ তখন তাঁর সকল মোহ দূরে সরিয়ে রেখে সেই সাতনরী হার জোর করে শতদলবাসিনীর গলায় পরিয়ে দিয়ে ফাঁসির মতো করে প্রাণপণে টেনে ধরলেন।

মুহূর্ত মধ্যে যেন একটা হিস্‌হিস্‌ শব্দ শোনা গেল। শতদল-বাসিনী সাপের রূপ ধরে মহারাজকে দংশন করতে এগিয়ে আসছে। হেলেঞ্চা বুড়ী হাসছে !

মহারাজের তখন মোহমুক্তি হয়েছে। সেই সাতনরী হার দিয়ে তিনি সাপটাকে জড়িয়ে ধরলেন কঠিন হাতে। তারপর সেই মৃত সর্পকে তিনি হেলেঞ্চা বুড়ীর গলায় বেঁধে এক মরণ ফাঁস লাগিয়ে দিলেন।

মুহূর্তে আর একটি অলৌকিক কাণ্ড সংঘটিত হল। এক বিরাট সর্বনাশা ভূমিকম্পে সমগ্র রাজপুরীটাই ধ্বংস হয়ে গেল। তার ভেতর স্বয়ং মহারাজ, হেলেঞ্চা বুড়ী আর শতদলবাসিনী যে কোথায় তলিয়ে গেল—কেউ তার সন্ধান রাখে না—।

শতদলবাসিনীর সেই অভিশপ্ত সাতনরী হার তোমরা খুঁজে বার করতে চাও ?

আবার সারা বন-ভূমি কাঁপিয়ে একটা তীক্ষ্ণ হাসি শোনা গেল।

বন্ধু হলো বনের প্রাণী

অনেকদিন আগের কথা। এক বনে কয়েকটি প্রাণী আর পাখ-পাখালি মনের আনন্দে থাকত। তাদের মধ্যে খুব মিলমিশ ছিল। তাই ঝগড়া-বিবাদ বড় একটা হতো না।

একটা গাছের নীচে থাকত একটা ভালুক আর একটা খরগোশ। আর গাছের ওপরে, ডালে থাকত একটা পায়রা আর একটা ময়ূর। এই চারজনের খুব ভাব। ওরা চারজনে গভীর বনে একসঙ্গে খাবার খুঁজতে বেরুতো। রাত্তিরবেলা গাছের ওপরে আর নীচে এক সঙ্গে থাকতো।

ভালুক সাথে খরগোশটা
থাকতো গাছের নীচে
ময়ূর সাথী পায়রা ডালে
থাকতো পিছে পিছে।

একদিন সেই বনের ভেতর দারুণ সোরগোল উঠল। একদল কাঠুরে কুঠার হাতে গাছ কাটতে এসেছে।

কুঠার হানে গাছের গোড়ায়
নাইকো দয়া-মায়া,
দূর করে দেয় নিবিড় বনের
মধুর শীতল ছায়া।

তখন ভালুক, খরগোশ, ময়ূর আর পায়রা প্রাণের ভয়ে ছুটতে ছুটতে নদীর ধারে এক ভাঙা পোড়ো বাড়িতে এসে হাজির হলো।

সেখানে একা একা এক বুড়ি থাকে। তিন কুলে তার কেউ নেই।

থুড়থুড়ে বুড়ি থাকে
ঝুরঝুরে বাড়িতে—

বড় দুখে দিন কাটে
চাল নেই হাঁড়িতে

সেই বুড়ির কাছে পায়রা, ময়ূর, ভালুক আর খরগোশ গিয়ে বলল, 'এই বাড়িতে আমাদের থাকতে দাও। বনে বড় বিপদ। তাই আমরা পালিয়ে এসেছি।'

বুড়ি বলল, 'আমিই খেতে পাই না, তোমাদের কি থাকতে দেবো?'

ওরা জবাব দিলো, 'আমাদের খাবার আমরাই জোগাড় করব। তুমি শুধু আমাদের তোমার বাড়িতে মাথা গুঁজতে দাও।'

তাই হলো।

পায়রা গিয়ে ভাঙা বাড়ির ফোকরে ডেরা বাঁধল। ময়ূর বকুল ডালে বাসা বাঁধল। ভালুক ভাঙা বাড়ির আঁধার কোটরে ঠাঁই করে নিলো। আর খরগোশ থাকল বুড়ির নড়বড়ে খাটের তলায়।

ওরা নদীর ধার, এখান ওখান থেকে খাবার জুটিয়ে আনে। তাতে বুড়িরও কুলিয়ে যায়।

ওরা বলে, 'বুড়িমা তোমায় আর ভিক্ষে করতে হবে না। আমরা তোমার চার ছেলে তো আছি, এক রকম করে চলে যাবে সবার।'

বুড়ির সাথে বনের প্রাণী
ভাবনা কিছুই নাই,
ভাঙা বাড়ির উঠোন মাঝে
নাচছে যে তাই-তাই

পাঁচজনের সুখী পরিবার!

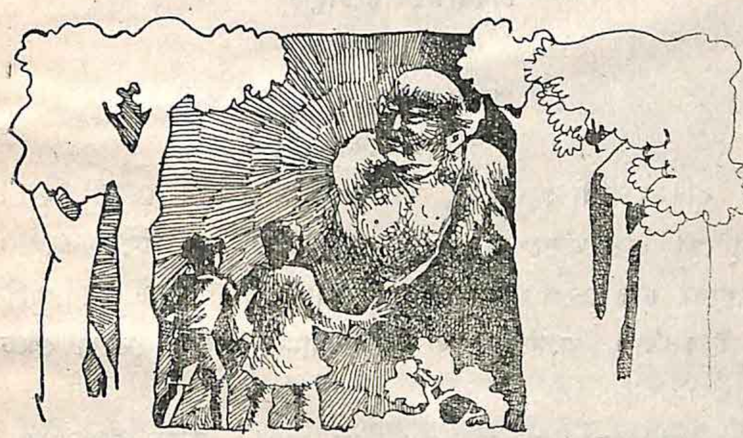
বুড়িমাকে নিয়ে আনন্দে আছে সবাই। একদিন বুড়ি বলল, 'ওরে বাছারা, মহাযোগ এসেছে। তোরা চারজন থাকতে আমি গঙ্গা চান করব না?'

বনের প্রাণীরা বলল, 'ঠিক, ঠিক। তোমার ভাবনা কি?

আমরা চার বন্ধু তোমায় পিঠে করে নিয়ে যাব। গঙ্গা চান করিয়ে নিয়ে আসব। ভয় কি?'

গঙ্গা চানে গেল বুড়ি
চারজনেরই পিঠে
ফিরে এসে বুড়ির হাতের
খায় যে গরম পিঠে।

কিন্তু গঙ্গার শীতল জলে চান করে বুড়ি মায়ের দারুণ অসুখ হলো। তখন চারজন খুব ভাবনায় পড়ল। কেউ ছুটল কব্‌রেজ



বাড়ি ওষুধ আনতে। আবার কেউ খড়কুটো জোগাড় করে আগুন জ্বালিয়ে মায়ের বুকে পিঠে সেঁক দেয়। কেউ রাত জেগে বুড়ির সেবা করে।

চারজনে দিন রাত
খাটে মার জন্যে—
বুড়ি যে আপনজন
বুঝবে কি অন্যে?

অনেক সেবা, অনেক রাত-জাগা, আর ছুটোছুটি দাপাদাপির পর চারজন তাদের বুড়িমাকে ভালো করে তুলল।

এইবার বুড়িমা অন্ন-পথ্য করবে।

ওরা বলল, 'তার জন্য আর ভাবনা কি?'

পায়রা বলল, 'ক্ষেতে ক্ষেতে কত সরু চাল পড়ে থাকে। আমি ঠোঁটে করে কুড়িয়ে নিয়ে আসব!'

ভালুক বলল, 'আমি দুধ আর মধু জোগাড় করে নিয়ে আসব।

ময়ূর বলল, 'আমি ঠোঁটে করে শাক লতাপাতা নিয়ে আসব।'

খরগোশ মাথা নেড়ে বলল, 'আমি আনব কচি কচি সবুজ সবুজ কপির পাতা। অসুখের পর মুখে ভালোই লাগবে।'

চারজনেরই ছুটোছুটি
পথ্যি হবে মায়ের—
পলতা পাতা, পালং শাক আর
দুধ যে এলো গাইয়ের।

বুড়িমা পথ্যি করে বলল, 'ভাগ্যিস আমার চার ছেলে ছিল। তাইতো এত অসুখের পর আমার মুখের স্বাদ ফিরে এলো। মানুষের চার ছেলে যা করতে পারে না, তোরা চারটি বনের প্রাণী তাই করলি! আমায় শেষ বয়সে আনন্দ দিলি। তোরা বেঁচে থাক।'

ধীরে ধীরে বুড়িমায়ের দেহে বল হলো। হাতে জোর পেল। হাঁটুতে দাঁড়াবার জোর খুঁজে পেল।

এই সব দেখে চার বনের প্রাণী খুশি হয়ে বুড়িমায়ের ভাঙা বাড়ির উঠোনে হাত ধরাধরি করে নাচে!

বুড়িমায়ের ভাঙা বাড়ি
পুলক মাঝে জাগে—
বুড়িমায়ের চারটি ছেলে
থাকল অনুরাগে।

বুড়িমায়ের দেহে যখন আরো বল হলো, তখন সে গাঁয়ের পথ ধরে হাঁটাহাঁটি করতে পারল।

তাই সে একদিন তার চার ছেলেকে ডেকে বলল, 'আর তো চুপচাপ বসে থাকতে পারিনা ! আমায় তোরা কাজ করতে দে নইলে বসে বসে হাঁটুতে বাত ধরে যাবে।'

চার ছেলেই খুশী হয়ে বলল, 'তার জন্য আর ভাবনা কি ? তুমি ঘরে বসে হালকা কাজ করবে। মজা পাবে, আয় বাড়বে, রাতে ভালো ঘুম হবে।'

ময়ূর বলল,
'রোজ রাতে দেবো তোরে
ময়ূর পাখা—
রামধনুকের রঙ
তাতে আঁকা
সেই পাখা নিয়ে মাগো
পাখা বুনবি—
হাটে হাটে বেচে দিয়ে
টাকা গুনবি।'

ময়ূর রোজ বুড়িমাকে ময়ূরের পাখা এনে দেয়। বুড়ি নিরিবিলি বসে সেই পাখায় সুশোভন করে ময়ুর-পাখা গড়ে তোলে। তাই হাটে হাটে বেচে অনেক টাকা-কড়ি পায়।

ভালুক বলল, 'মাগো তুমি একটা হাঁড়ি জোগাড় করে রাখো। আমি বন থেকে মধু নিয়ে আসব। তুমি সেই মধু হাটে হাটে বেচে অনেক টাকা পাবে।'

পায়রা বলল, 'আমি ঠোঁটে করে কিষাণদের উঠোন থেকে সরু চাল নিয়ে আসব। তাই তুমি একটা গোলায় জমিয়ে রাখবে। তোমার কখনো চালের অভাব হবে না।'

খরগোশও একেবারে পিছিয়ে নেই। সে বলল, 'আমি কচি কচি সব আনাজ-তরকারি নিয়ে আসব। তুমি মরিচ ফোড়ন দিয়ে

ঝাল ঝাল তরকারি রাঁধবে। আমরা সবাই মিলে মজা করে তোমায় ঘিরে খাব।'

বুড়ির সংসারে এই ভাবে ধীরে ধীরে বাড় বাড়ন্ত হতে লাগল।

বুড়ি ময়ূরের পাখা বেচে হাটে হাটে। খাঁটি মধু বেচে বাজারে বাজারে। বুড়ির গোলায় চালের অভাব নেই। আর তরকারি অঢেল আসছে।

মা লক্ষ্মী আসন পাতেন
বুড়ি মায়ের ঘরে।
পিঠে-পায়েস সাজায় বুড়ি
চারটি ছেলের তরে।

বুড়ির দেহে বল ফিরে এসেছে।

মনে জেগেছে অসীম পুলক।

রোজ সাঁঝের বেলা বুড়ি তুলসী তলায় পিদিম জ্বেলে প্রণাম করে। লক্ষ্মীবারে মা লক্ষ্মীর আসন পাতে।

বুড়ির চার ছেলে মিলে সেই ভাঙা দালান সারিয়ে তোলে। বাড়ির সামনে ফুলের বাগান করে, বাড়ির পেছনে ফলের বাগান গড়ে।

একদিন চারজনেই বলল, 'মা গো, আমরা তোমার বাড়ির সামনে পুকুর কাটব।'

বুড়ি অবাক হয়ে শুধোল, 'তোরা কি পারবি?'

ভালুক জবাব দিল, 'আমি গিয়ে বনের প্রাণীদের খবর দেবো। তারা হাত লাগালে আর ভাবনা নেই। মাটি কাটা অমনিতেই এগিয়ে যাবে।'

তা-ই হলো।

বন্ধুদের কাছে খবর পেয়ে দলে দলে বনের প্রাণী—বরাহ, শেয়াল, গণ্ডার, হাতি এসে কয়েক দিনের মধ্যেই এক বিরাট জলাশয় খুঁড়ে ফেলল।

তার তীরে গড়া হলো এক নতুন শিবালয়। সেখানে বুড়ি তার চার ছেলেকে নিয়ে ঘটা করে নিত্যি পূজোর আয়োজন করল।

তারপর বনের প্রাণীদের সবাইকে ডেকে এক বিরাট ভোজ দিলো। সবাই খুশি!

বুড়ি এখন সবার মা যে—
পশু-পাখির দল,
বুড়ির নতুন উঠোন-জুড়ে
করছে কোলাহল!